চাঁদমামা
আগষ্ট ১৯৭২

আমাদের পত্রিকার প্রথম পাঠক পশ্চিম বঙ্গের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী
শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : 'চক্রপাণী'

বহু চিঠির মাধ্যমে জানতে পেরেছি জুলাই সংখ্যা চাঁদমামা অনেককে আনন্দ-দান করেছে। অনেকের ভাল লেগেছে। এই ভাল লাগানোর জন্যই প্রত্যেক পাতায় ছবি ছাপা হয়। মজার মজার গল্প বেরোয়। এবারের সংখ্যায় ছোট বড় ষোলটি লেখা আছে। যক্ষ-পর্বত, মহা-শিল্পী, খেয়ালী রাজা, বাহাদুরীর ফল, স্বামীর খোঁজে, হৃদয়-ফলক প্রভৃতি। তাছাড়া আছে মহাভারত এবং আরও কত কি! আর একটি কথা, চৌষট্টি পাতায় যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে তাতে চাঁদমামার যে কোন পাঠক-পাঠিকা যোগ দিতে পারে।

আগস্ট'৭২ দ্বিতীয় সংখ্যা

দুষ্টা ভার্যা, শঠো মিত্রম্
ভৃত্যোহঙ্কারসংযুতঃ,
সসর্পে চ গৃহে বাসো,
মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ। ॥ ১ ॥

[দুষ্ট প্রকৃতির স্ত্রী, মুর্খবন্ধু, অহঙ্কারী চাকর এবং সাপের নিবাসকারী ঘর নিশ্চিত ভাবে জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর।]

যস্মিন্ দেশে ন সন্মানো,
ন প্রীতি, রঞ্চ বান্ধবাঃ,
ন বিদ্যা, নাস্তি ধনীকো,
ন তত্র দিবসম্ বসেৎ। ॥ ২ ॥

[যে দেশে আদর আপ্যায়ন নেই, ভালবাসা নেই, বিদ্যা নেই, ধনী নেই সেই দেশে এক দিনও থাকা উচিত নয়।]

কুচেলিনম্, দন্তমলাপহারিনম্,
ব্রহ্মাশিনম্, নিষ্ঠুরবাক্যভাষিণম্,
সূর্যোদয়েচাস্তময়ে চ শায়িনম্,
বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপাণিনম্। ॥ ৩ ॥

[যে ময়লা জামা কাপড় ধারণ করে, দাঁত অপরিচ্ছন্ন রাখে, পেটুক, নিষ্ঠুর কথা বলে, সকালে এবং সন্ধ্যায় ঘুমায় সে স্বয়ং বিষ্ণু হলেও লক্ষ্মী তাকে পরিত্যাগ করে।]

মানুষের স্বভাব

কোন এক গ্রামে দাসু নামে এক কিসান ছিল। তার জমির ফসল দিয়ে সারা বছর কোন রকমেই চলতনা। তাই তাকে ধার করতে হোত। ধার বাড়তে বাড়তে এমন দিন এলো যখন সে আর ঐ ধার শোধ করতে পারল না।

"থাকলে খাব আর না থাকলে উপোষে কাটাব। জমি বিক্রী করে ধার শোধ করে দেওয়াই ভাল।" এই কথা দাসুর বউ বলল। দাসু জমি বিক্রী করতে চেষ্টা করতে লাগল। বিপদে পড়ে বিক্রী করছে জেনে গ্রামের লোক জলের দামে কিনতে চাইল তার জমি।

ঐ গ্রামেই শ্রীনিবাস নামে আর এক-জন কিসান ছিল।

ঠাকুর্দার আমলে দাসুদের অবস্থা ভালই ছিল। সেই আমলে শ্রীনিবাসদের ঠাকুর্দারা দাসুদের ঠাকুর্দাদের কাছে সাহায্য নিয়ে ছিল। তাই শ্রীনিবাস ন্যায্য দর দিয়ে দাসুর জমি কিনল।

সেই টাকা দিয়ে দাসু সমস্ত ধার শোধ করে সংসার চালাবার জন্য দিন মজুরী করতে বেরুলো। সেই কথা জানতে পেরে শ্রীনিবাস দাসুকে বলল, "মজুরীই যদি করতে হয় তো তোমার বিক্রী করা জমিতেই কাজ করনা কেন। তোমার খরচ চালাবার ভার আমি নিচ্ছি।"

"তাহলে তো ভালই। আমার কাছে আপনি ভগবান।" দাসু বলল। এবং সেই দিন থেকেই শ্রীনিবাসের জমিতে কাজে লেগে গেল।

একদিন জমিতে কাজ করার সময় দাসুর লাঙ্গলের ফলায় কী যেন ঠেকল। জমি খুঁড়ে দেখে দুটি ঘড়া। ঘড়াগুলো তুলে তার মুখ খুলে দেখতে পেল তার ভেতর রয়েছে অনেক সোনার অলঙ্কার

আশুতোষ দে

তো তোমার কাছ থেকেই কিনেছি। তাই ন্যায় বিচারে ঘড়াগুলো তোমারই।"

"তাকি কখনও হয়। ঐ জমি আপনার কাছে বিক্রী করে দিয়েছি। অতএব, ঐ জমিতে যা পাওয়া যাবে সব আপনারই। আমার কি করে হবে? আপনি দয়া করে আপনার ঐ জমিতে আমাকে কাজ করতে দিলেন। ইচ্ছে করলে অন্য কাউকে দিয়েও ঐ জমিতে কাজ করাতে পারতেন।" দাসু বলল।

"দেখ দাসু, জমিতে যে ফসল উঠবে তার উপর আমার হক আছে ঠিক কিন্তু তাই বলে এসব উঠলে কি আমার
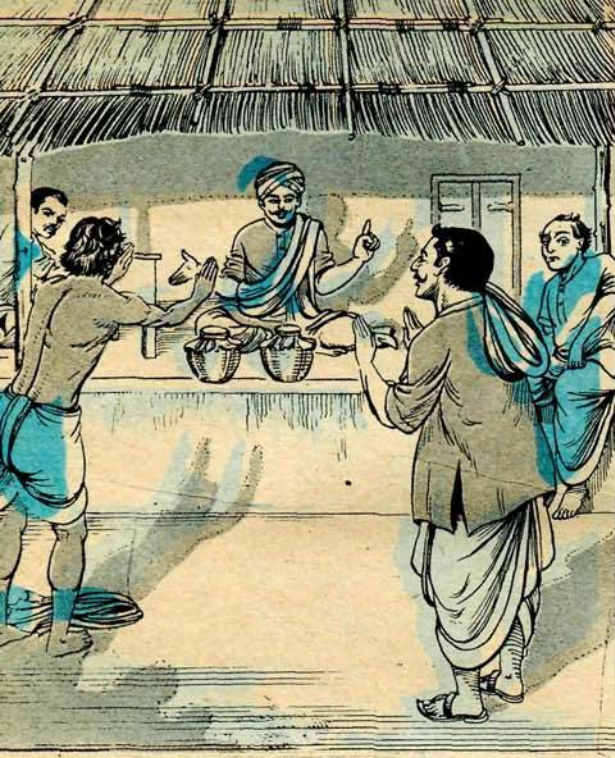
এবং মোহর।

দাসু তাড়াতাড়ি সেই ঘড়া দুটো বয়ে আনল শ্রীনিবাসের বাড়িতে। দাসু বলল, "ঘড়া দুটো সাবধানে রাখুন। এসব আপনার জমিতে পেয়েছি। ক্ষেতে লাঙ্গল আর বলদ রেখে এসেছি। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।"

দাসুর কাণ্ড দেখে শ্রীনিবাস অবাক হোল। এতখানি সততায় সে আশ্চর্য হোল। পরে বলল, "দাসু, তোমার সততার জন্য কী যে বলব ভেবে পাচ্ছি-না। এত অলঙ্কার গিণি তুমি রেখে দিতে পারতে। আর তা না করে তুমি আমার বাড়িতে এনে দিলে! শোন, ঐ জমিটা

নেওয়া উচিত? আমি কি সে রকম দাম দিয়ে কিনেছি? এ জমিতে তুমি কেন অন্য কোন লোক কাজ করলেও এই ঘড়া দুটো আমি তোমাকেই দিতাম। অন্যায় করলে ভগবানের কাছে ক্ষমা পাব?" বলল শ্রীনিবাস।

"আমিও তো সেই কথাই বলছি বাবু, ঐ ঘড়া থেকে একটি মুদ্রাও যদি নি, আমি কি ভগবানের কাছে ক্ষমা পাব? অধর্ম হবে না?" দাসু বলল।

তারা দুজনে গ্রামের বিচারপতির কাছে গেল। যে যার বক্তব্য বলল। ঐ সময়ে গ্রামাধিকারীর ছোট ভাই গোপীনাথ সেখানেই ছিল।

দাসুর আর শ্রীনিবাসের কথা গ্রামাধিকারীর কাছে অদ্ভুত ঠেকল। সব কথা শুনে বলল, "এর জন্য এত হৈ চৈ এর কী আছে। দুজনের প্রত্যেকে একটি করে ঘড়া নিয়ে নিলেই তো হয়।"

এই বিচারে তাদের দুজনের কেউই খুশি নয়। দুজনই বলল এটা অন্যায়।

গোপীনাথ এগিয়ে এসে বলল, "আমার কথা মতো কাজ করলে তোমরা দুজনেই ন্যায় বিচার পাবে।"

"বেশ, তাই বলুন।" দাসু এবং শ্রীনিবাস বলল।

"তোমরা দুজনেই একটা করে ঘড়া নিয়ে গিয়ে যে যার বাড়িতে এক মাস রাখ। এক মাস পরে বিচার চাও তো হবে।" গোপীনাথ বলল।

দুজনে একটা করে ঘড়া নিয়ে গেল যে যার বাড়িতে।

তাদের চলে যাওয়ার পর গ্রামাধিকারী তার ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এ তুমি কেমন বিচার করলে? এক মাস পরে আমি কী বিচার করব?"

"এক মাস পরে ওরা তোমার কাছে বিচার চাইতে এলে তো?" গোপীনাথ কেমন নিশ্চিন্তে হাসতে হাসতে বলল।

"কেন? আসবেনা কেন?" গ্রামাধিকারী আশ্চর্য হয়ে বলল।

"মাত্র একসপ্তা ধৈর্য ধর, তারপর দেখতে পাবে।" বলল গোপীনাথ।

একসপ্তা কেটে গেল। একদিন মাঝ
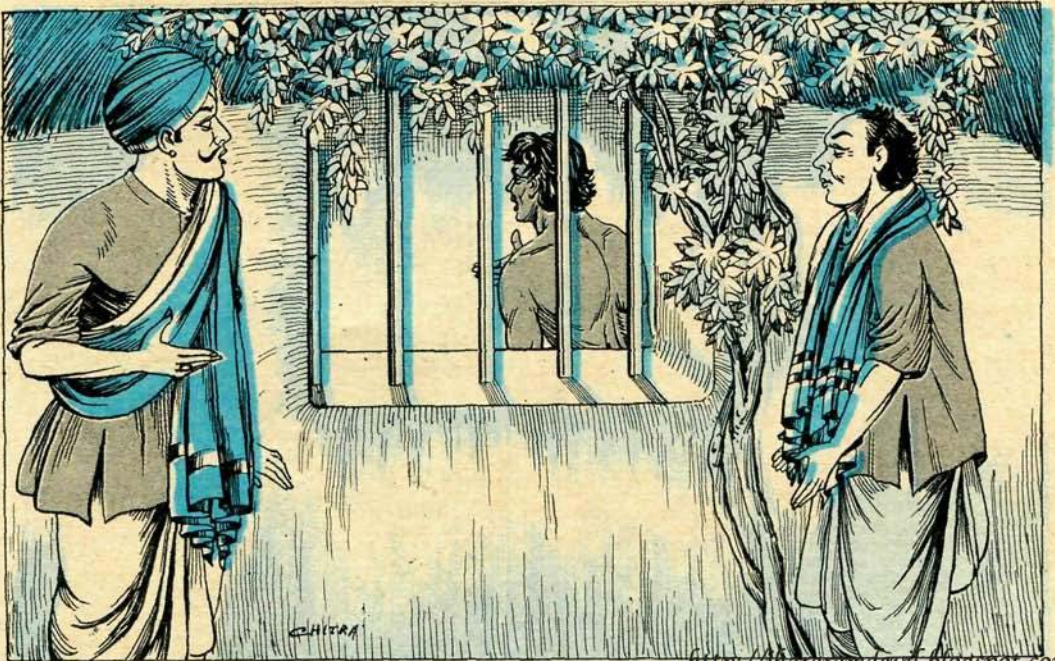
রাতে গোপীনাথ দাদাকে নিয়ে দাসুর বাড়ির জানালার পাশে দাঁড়াতে বলল। ঘরের ভেতর থেকে দাসুর কথা শুনতে পেল, "আগেকার সেই খাটাবার শক্তি গতরে আর নেই। বাচ্চারাও তো বড় হচ্ছে। ন্যায্য তো দুটো ঘড়া আমারই নেওয়া উচিত ছিল। জমি বিক্রীর আগে পেলে তো কথাই ছিলো না। কিন্তু এখন এত কাণ্ডের পর দুটো ঘড়াই আমাকে দেওয়া হোক বললে লোকে হাসবে। তার চেয়ে এই ঘড়াতে যা আছে তাই দিয়ে জমি কিনে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দি।" বলল দাসু।

সেখান থেকে গ্রামাধিকারী এবং তার ছোট ভাই গোপীনাথ গেল শ্রীনিবাসের বাড়ির কাছে। সেখানে শুনতে পেল, "দাসুর কথামতো দুটো ঘড়াই রেখে দিলে পারতাম, জমি যখন আমি কিনেছি। ঐ জমির ঘড়াগুলোতো আর দাসু জমিতে পুঁতে রাখেনি! কিন্তু এখন এই একটা ঘড়া নিয়েই আমাকে খুশী থাকতে হবে।" বলল শ্রীনিবাস।

বাড়ি ফিরতে গোপীনাথকে দাদা বলল, "তোমার কথাই দেখছি সত্য! কিন্তু সেদিন ওদের কথা শুনে মনে হয়েছিল, দাসু আর শ্রীনিবাস খুব নীতি মেনে চলে। আচ্ছা, ওদের আসল ব্যাপারটা তুমি কেমন করে টের পেলে বল দেখি?"

"ওদের নীতি আর সততার তুমি ওভাবে বিচার করনা। নীতিহীন হলে দাসু ঐ ঘড়া দুটো শ্রীনিবাসকে কিছুতেই দিতো না। শ্রীনিবাসও নীতিহীন নয় বলেই ঐ ঘড়া দুটো নিতে চাইল না। কিন্তু টানা একসপ্তা ধরে ধনলক্ষ্মী চোখের সামনে থাকলে যত বড় নীতিবানই হোক না কেন টলে যেতে বাধ্য। এইটাই তো মানুষের স্বভাব।" বলল গোপীনাথ!

ঐ রাত্রে দাসু আর শ্রীনিবাসকে দিয়ে যারা ঐ ধরণের কথা বলালো তারা গোপীনাথেরই লোক।

দেবতার সাহায্য

হিমালয়ের পাদদেশে এক ঘাটি ছিল। ঐ ঘাটিতে কয়েক হাজার বছর আগে এক পাহাড়ী জাতি বাস করত। ঐ জাতের লোক পশু পালন, ধানের চাষ প্রভৃতি করে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু ক্রমশ ঐ অঞ্চলে ফসল ফলানো আর পশুপালন করা কষ্টকর হয়ে উঠল। তার কারণ উঁচু পাহাড় থেকে ছোট বড় পাথর গড়াতে গড়াতে ঘাটির উপর পড়ত। কয়েকশো বছর ধরে এই ভাবে পড়তে পড়তে সেই ঘাটি পাথরের টুকরোতে ভরে গেল।

সেই ঘাটিতে বাস করা ক্রমশ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। পাহাড়ী জাতের কয়েকজন যুবক নিজেদের মধ্যে কথা বলে ওদের নেতার কাছে গেল, "দাদু, স্থান পরিবর্তন না করলে আমাদের তো নাম গোত্র লোপাট হয়ে যাবে। পেট ভরে আমরাও খেতে পাচ্ছিনা আর আমাদের পশুদেরও খেতে দিতে পারছিনা। এই ঘাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যাই চলুন।"

বৃদ্ধ নেতা ওদের দিকে রায় ঘোষণা করার ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলে, "এই ঘাটি অনন্তকাল থেকে আমাদের। আমাদের দাদুরা আর তাদের দাদুরা এই মাটিতেই মিশে গেছে। অন্য অঞ্চলে গেলে আমাদের জীবিকা বদলে যাবে।"

"এই ঘাটি মরে গেছে, আমাদের নাম ধাম মুছে যেতে বসেছে, তার চেয়ে আমাদের বদলে যাওয়াই ভাল।" বলল যুবকেরা।

"ওরে, এই ঘাটি মরে যায়নি, আমি দেখাবো এসো।" বলে বৃদ্ধ নেতা যুবকদের নিয়ে গিয়ে দেখাল একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড। ঐ পাথর সরাতে

পরিমল ভট্টাচার্য

বলল। পাথর ঠেলে সরালো। তার নিচে ছিল চমৎকার কালো মাটি।

"ওরে এই মাটিই তো সোনা। এই মাটিতেই সোনা ফলে। প্রত্যেকটা পাথরেব নিচে এই ধরণের সোনা ফলানো মাটি আছে।" বলল সেই বৃদ্ধ।

"সমস্ত ঘাটিতে পাথর থরে থরে পড়ে রয়েছে। আমরা কটা পাথর সরাবো? তুমি আমাদের জন্য অন্য কোন অঞ্চল খুঁজে বের কর।" বলল যুবকেরা।

"ঠিক আছে, তবে আমি আমাদের গণদেবতাকে জিজ্ঞেস করি উনি যে আজ্ঞা দেবেন সেই মতো আমরা কাজ করব।" বলল বৃদ্ধ দল নেতা।

তার পরের দিনই গোষ্ঠীর সবাইকে ডেকে পাঠাল বৃদ্ধ দল নেতা। ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ি সবাই বসল সভায়।

"গণদেবতা কাল রাত্রে আমাকে স্বপ্নে বলেছে যে তার জন্য একটি আলয় বানাতে হবে। আর আমাদের ঘরগুলো বানাতে হবে সেই আলয়কে ঘিরে। তারপর আমাদের দিন ফিরবে। ভাল দিন আসবে।" বলল সেই বৃদ্ধ।

সবাই তার কথায় উৎসাহিত হোল। ছেলেরা বাচ্চারা সব ছোট ছোট পাথরের টুকরো কুড়িয়ে এনে জড়ো করল। কিছু-দিনের মধ্যেই আলয় গড়ে উঠল। বৃদ্ধের কথা মতো মন্দিরকে উঁচু জায়গায় করা হোল। তারপর আরও পাথর জোগাড় করে ঘর তোলা হোল।

এই সমস্ত কাজ করতে অনেক পাথর তুলতে হয়েছে। ফলে চার ভাগের তিন ভাগ মাটি দেখা দিল। সেই মাটি বেশ উর্বর। মাটিতে বীজ বপন করতেই গাছ গজিয়ে ওঠে। আর যে জমিতে মাটি কম ছিল সেখানে গজিয়ে উঠল সবুজ ঘাস।

এইভাবে মানুষ আর পশুর খাবার উপযোগী অঢেল ফসল ফলল। এর ফলে সবাই তাদের গণদেবতার কাছে কৃতজ্ঞ রইল।
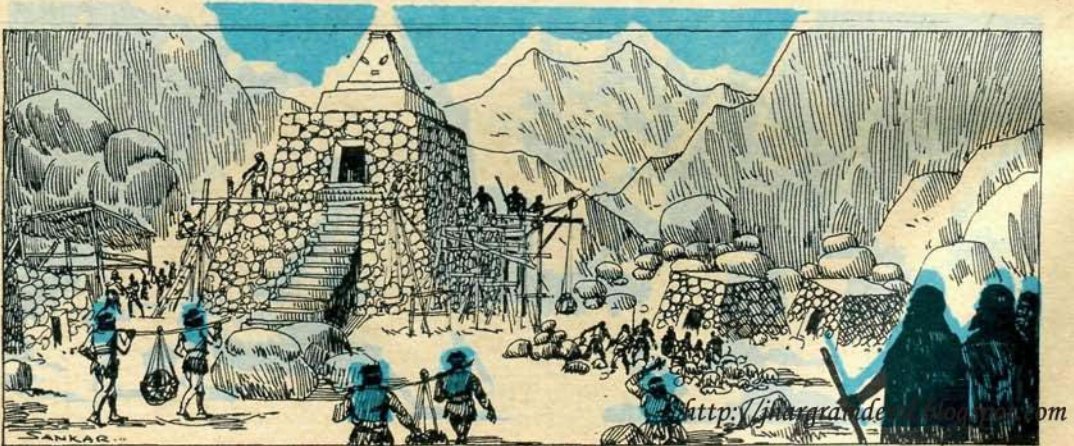
যক্ষপর্বত

কয়েক হাজার বছর আগের কথা। নর্মদা নদী তীরের অরণ্য সমূহে পাহাড়ী জাতের লোকেরা বাস করত। ওদের মধ্যে এক এক জাতের লোকের একজন করে নেতা অথবা রাজা থাকত। সেই সবাইকে পরিচালনা করত। ওদের মধ্যে ঐক্যমত না থাকায় ওরা একের বিরুদ্ধে অন্যে লড়তে লাগল।

ঐ পাহাড়ীদের একটি অংশ গণ্ডক জাতি নামে খ্যাত ছিল। সেই অরণ্যের পাহাড়ের একটিতে অরণ্যপুরম নামে এক বড় জনপদ ওরা গড়ে তুলল। গণ্ডারদের ভাল শিক্ষা দিয়ে তাদের চাষ আবাদের কাজে এবং বাহন হিসেবে ব্যবহার করত। চাষের কাজে এবং বোঝা বওয়ানোর কাজে ব্যবহার করত বলেই ওদের নাম হয়েছিল গণ্ডক জাতি।

ঐ গণ্ডক জাতের নতুন রাজা হোল এক যুবক। তার নাম অরণ্যমাল্লু। সেই রাজাকে হটানোর জন্য গণাচারি নামে একজন ভীষণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দুজন ক্ষত্রিয় যুবকদের সাহায্যে অরণ্যমাল্লু ঐ গণাচারির ছল চাতুরির কথা প্রচার করিয়ে তাকে বাঘের মুখে ঠেলে দেয়।

গণাচারিকে মেরে ফেলার পর অরণ্য-মাল্লু নিশ্চিন্তে রাজ্য শাসন করছিল। কোন বাধা নেই। নিজের ইচ্ছেমত চলছিল। আগে যে গণ্ডক জাতি শুধু শিকার করেই পেট চালাত আজ তারা

চারদিকের জমিতে চাষ আবাদ করছে। ভুট্টা যব গম প্রভৃতির চাষ করতে লাগল।

অরণ্যমাল্লু সিংহাসনে বসে এক বছর পূর্ণ হোল। সেদিন মহোৎসব পালনের আয়োজন করল গণ্ডক জাতের লোকেরা। যুবকেরা বর্শা বল্লম ঘোরাতে ঘোরাতে নানান খেলা দেখাতে লাগল। নানান ধরনের লাঠি খেলা, কুস্তি প্রভৃতি অনেক রকমের খেলা দেখাতে লাগল। যুবক-যুবতী, ছেলে মেয়ে, বুড়োবুড়ি সবাই সেই উৎসবে মেতে আছে। স্বয়ং অরণ্যমাল্লু উঁচু জায়গায় খোদাই করা আসনে বসে সেই সব উপভোগ করছে।

সেই উৎসব মুখরিত সময়ে দুজন গণ্ডক জাতের লোক বাহনে চড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বাহন থেকে নেমে দুহাতে ভীড় ঠেলতে ঠেলতে অরণ্যমাল্লুর কাছে এগোতে থাকল।

অরণ্যমাল্লুর মন্ত্রীর নাম শিলামুখী। ঐ দুজনকে রাজার দিকে ধেয়ে যেতে দেখে ইশারায় ওদের কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার? এমন ভাবে ছোটা ছুটি করছ যেন কোথায় আগুন লেগেছে! এমন উৎসব আনন্দের সময় রাজাকে বিরক্ত করতে ছোটাছুটি করছ কেন? আমি কি নেই এখানে?" "কী ব্যাপার বল? রেগে গিয়ে বলল মন্ত্রী।

মন্ত্রীর প্রশ্ন শুনে আগন্তুকরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চায়ি করতে লাগল। ঐ দুজনের মধ্যে লম্বা লোকটা গলা ঝেড়ে বলল, "পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের চাষের ক্ষেতে যে ভুট্টা যব ফলেছে সে সব নতুন লোক এসে কেটে ফেলছে। ওরা আমাদের চেনা জানা আদিবাসীদের মত দেখতে নয়। ওদের মাথায় বড় বড় পাগড়ী। ওদের সারা শরীর কাপড় চোপড়ে ঢাকা রয়েছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হোল এই অরণ্যের গোটা তল্লাটে যে ধরনের জন্তু কোন দিন নজরে পড়েনি ওরা সেই ধরনের বিরাট বিরাট জন্তুর পিঠে চড়ে এসেছে। ঐ

জন্তুর পিঠেই কাটা ভুট্টা যব চাপাচ্ছে।"

"নতুন ধরনের জন্তুগুলো কেমন দেখতে ?" বলল মন্ত্রী শিলামুখী।

"ঐ জন্তুগুলো হাতীর মত উঁচু। হাতীর চোখের মত ওদের চোখ। ঘাড়-গুলো বকের ঘাড়ের মত এদিক ওদিক ঘোরে। পিঠের উপর ঢিপির মত কী যেন আছে।" বলল ওদের মধ্যে বেঁটে লোকটা।

মন্ত্রী এবং ওদের দুজনের মধ্যে কথা চলছে। অন্যেরা কৌতূহল বশত সে কথা শোনার চেষ্টা করে। আস্তে আস্তে ওদের ঘিরে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঐ অদ্ভুত জন্তুর বর্ণনা কানে যেতেই ওদের অনেকে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। এক কান দুকান হয়ে কথাটা ছড়িয়ে গেল। বলাবলি করতে লাগল ওরা, "কারা যেন অদ্ভুত জন্তুর উপর চেপে এসে আমাদের যব ভুট্টা সব কেটে নিয়ে যাচ্ছে।" প্রত্যেকে কথা বলায় একটা হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। উৎসবের আনন্দ ক্রমশ যেন মিইয়ে যাচ্ছে। ওদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে রাজা আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এত হৈ চৈ কিসের ? কি হয়েছে ? মন্ত্রী শিলামুখী কোথায় ?" বলল গর্জন করে

শিলামুখী ঐ অদ্ভুত জন্তুগুলোকে যারা

দেখেছে সেই দুজনকে নিয়ে রাজার কাছে এলো। ওদের কাছে যা শুনল তা রাজাকে জানাল।

"আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো ফসল লুণ্ঠনকারীরা নিয়ে যাচ্ছে দেখে হাঁ করে বসে আছ! হাতিয়ার এখনো হাতে তুলে নাওনি! নামেই দেখছি আমি এক রাজা, মন্ত্রীও জুটেছে তেমনি! যতসব বোবাদের দেশ।" বলল অরণ্যমাল্লু।

অরণ্যমাল্লুর কথা শেষ হতেই শিলা-মুখী গণ্ডক জাতের লোকের দিকে ঘুরে জোরে জোরে বলল, "এই আনন্দ উৎসব এখনকার মতো বন্ধ হোক। আমাদের

ক্ষেতের ফসল লুণ্ঠনকারীরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের হটিয়ে দিয়ে আমাদের ফসল্ল রক্ষা করতে হবে।"

তৎক্ষণাৎ গণ্ডক জাতের লোকেরা বর্শা, বল্লম, ছোরা হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একজন অনুচরের আনা গণ্ডারে চড়ে মন্ত্রী শিলামুখী সামনে এগিয়ে গেল।

রাজা অরণ্যমাল্লু ওদের উৎসাহ দিতে দিতে জোরে জোরে বলল, "ঐ লুন্ঠন-কারীরা যে অদ্ভুত জন্তু এনেছে তাদের আপনারা ভয় পাবেন না। আমাদের বাহন গণ্ডারের চেয়ে হিংস্র জন্তু পৃথিবীতে আর একটিও নেই। ঐ লুন্ঠনকারীদের কয়েকজনকে বন্দী করে আনুন। ওদের কাছ থেকে ঐ দুরাত্মাদের সমস্ত খবর জানতে পারব।" বলল রাজা।

"জয় অরণ্য মাতা কী জয়! জয়! রাজা অরণ্যমাল্লুর জয়!" এই রণ ধ্বনি দিতে দিতে গণ্ডক জাতের লোকেরা ধাবিত হোল ঐ পাহাড়ের পাদদেশে।

ওরা সবাই নিজেদের ফসল ফলানো ক্ষেতে পৌঁছে প্রত্যেকে কেমন যেন হতবাক হয়ে গেল। যা ওরা দেখছে তাতেই ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছে। লুন্ঠনকারীদের সংখ্যা পঁচিশ কি তিরিশ। তাদের মধ্যে কয়েকজন ভুট্টা ও যবের গাছ কাটছে। কয়েকজন এক মুহূর্ত নষ্ট না করে সেই ফসল তুলছে। ঐ বিরাটকায় জন্তুর ঢিপিওয়ালা পিঠে। আর চার পাঁচজন সেই বিরাট-কায় অদ্ভুত জন্তুর পিঠে চড়ে ক্ষেতের এ কোন থেকে ও কোন পর্যন্ত ছোটাছুটি করছে। ঐ জন্তুগুলো ঘাড় উঁচু নিচু করতে করতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ছোটাছুটি করছে।

লুণ্ঠনকারী আর তাদের বাহক জন্তুদের দেখে গণ্ডক জাতের লোক খুব ভয় পেয়েছে। তার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে লুণ্ঠনকারীরা গণ্ডারের পিঠে চেপে আসা গণ্ডকজাতের লোকদের দেখে।

লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে ঐ অদ্ভুত জন্তুর উপর উঠে বসে থাকাদের মধ্যে একজন হাতের বর্শা উঁচিয়ে ধরে চিৎকার করে বলল, "এই, যারা আসছে ভয়ঙ্কর জন্তুর উপর চড়ে তাদের দিকে আর ঐ জন্তুদের দিকে ভাল করে তাকান! যারা গণ্ডারদের শিক্ষা দিয়ে বাহনের কাজে ব্যবহার করছে তারা যে কত বড় সাহসী হতে পারে বুঝতে পারছেন!"

সাথীদের একজনের ঘোষণা শুনে যারা যে কাজে লেগে ছিল তারা একবার মাথা তুলে তাকাল। ওরা দেখতে পেল গণ্ডারের উপর চেপে সবার সামনে আসছে মন্ত্রী শিলামুখী, তার কিছুটা পেছনে আসছে গণ্ডারের পিঠে চড়ে আরো অনেকে। সবার পেছনে আসছে পায়ে হাঁটা লোক। ওরা ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে।

লুণ্ঠনকারীদের একজন তাড়াতাড়ি ঐ বিচিত্র জন্তুর উপর ওঠে গণ্ডক জাতের লোকের দিকে তাকাল। ওদের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হোল ওরা যেন আক্রান্ত। প্রত্যেকে কেমন যেন হুড়োহুড়ি করছে। গণ্ডারের উপর চড়ে কেউ ঠিক এগোচ্ছেনা। সে চিৎকার করে নিজের লোককে বলল, "হে উষ্ট্রবীরেরা! আমাদের কোন ভয় নেই! আমাদের দেখে ঐ গণ্ডক জাতের লোক যেন একেবারে মূর্চ্ছা যাচ্ছে। চেয়ে দেখে, একজনও সাহসের সাথে ঘৃণা ভরে দ্রুত
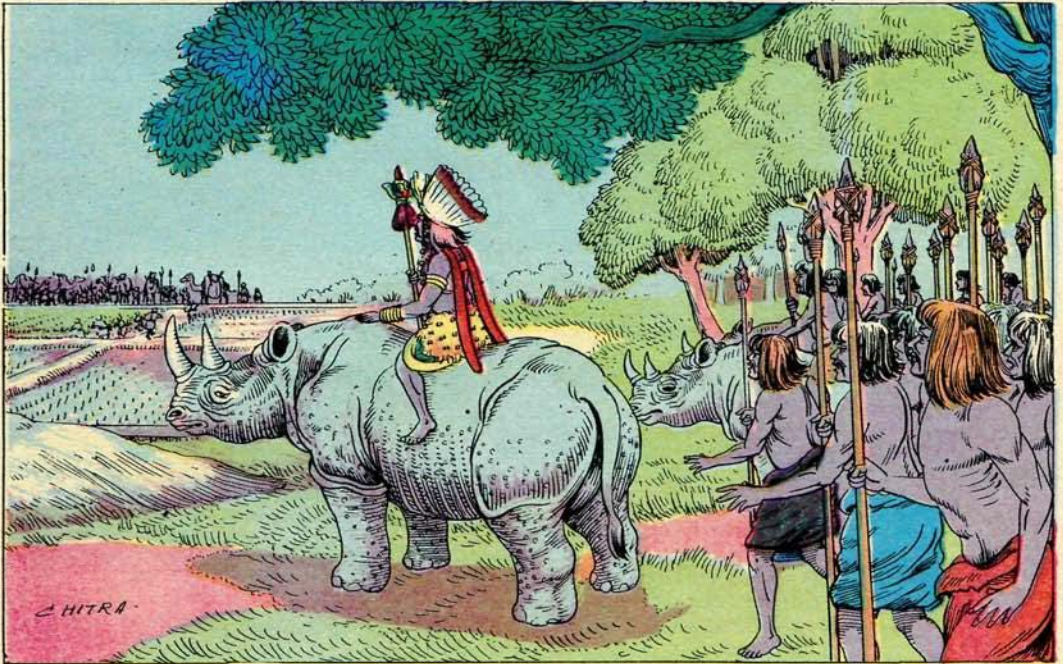
এগিয়ে আসছে না! প্রত্যেকে কেমন যেন নিজেদের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করছে। এই হোল মোক্ষম মুহূর্ত। আমার সাথে চার পাঁচজন এসো। চারিদিক থেকে ওদের উপর বর্শা ছুঁড়ে ওদের ছত্রভঙ্গ করে ফেলব।" বলল ওদের নেতা।

নেতার ডাক শুনেই চারজন উটের পিঠে চড়ে বল্লম নিয়ে এগিয়ে গেল। ঐ কজনের ওভাবে এগোতে দেখেই মন্ত্রী শিলামুখী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অনুচরদের বলল, "এই অদ্ভুত বিরাট উঁচু জীবের উপর বসে থাকা লুণ্ঠন-কারীর দল উপর থেকে বল্লম ছুঁড়ে সহজেই আমাদের গেঁথে ফেলতে পারে। আমরা বরং একটু পেছিয়ে গিয়ে গাছের আড়ালে চলে যাই। লুণ্ঠনকারীরা আমাদের তাড়া করতে করতে আসবে। তখন আমাদের লোক গাছের উপর থেকে বর্শা ছুঁড়ে সহজেই ওদের জব্দ করতে পারবে। আমাদের অনুচরদের গাছে উঠতে বলা হোক।" চিৎকার করে হুকুম দিল মন্ত্রী শিলামুখী।

শিলামুখী তার অনুচরদের এই নির্দেশ অনেক দেরিতে দিলো। মন্ত্রীর কথা কানে যেতেই যারা গণ্ডারের পিঠে বসেছিল তারা গণ্ডারের মুখ পেছনের দিকে ফিরিয়ে বলল, "যারা পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করতে এসেছো তারা সব গাছে উঠে পড়। ঐ লুণ্ঠনকারীরা গাছের নিচে আসতেই তাদের বল্লম দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলবে।" ওরা চিৎকার করেই বলতে লাগল।

গণ্ডকজাতের কয়েকজন গাছের উপর উঠতেই লুণ্ঠনকারীদের নেতা অবস্থা বুঝে বলল, "ওহে যব আর ভুট্টা কাটা বন্ধ করে এখন যে যার বাহনে ওঠো। আমি কয়েকজনকে নিয়ে এই গণ্ডারের উপর বসে থাকা লোকদের ক্ষমতা একটু যাচাই করে দেখছি। আর বাকি যারা আছ তারা ওদের মধ্যে যারা গাছে উঠে বসে আছে তাদের বর্শা দিয়ে খোঁচা

মেরে নিচে ফেলে দাও।" চিৎকার করে হুকুম দিল নেতা।

শিলামুখী নিজের গণ্ডারটার মুখ পেছনের দিকে ঘোরাতে যাবে এমন সময় হঠাৎ লুণ্ঠনকারীদের নেতা এবং তার অনুচরেরা তাকে ঘিরে ফেলল। শিলামুখী ধৈর্যধরে লুণ্ঠনকারীদের নেতার আক্রমণ নিজের বর্শা দিয়ে রুখলো।

"জয় অরণ্য মাতা! সবাই গণ্ডারদের অরণ্যের দিকে ছোঁটাও!" চিৎকার করে বলল।

শিলামুখী নিজের প্রাণরক্ষার জন্য এত ব্যস্ত ছিল যে অন্যদিকে কি হচ্ছে-না-হচ্ছে তা আর দেখতে পারেনি। ওদিকে গাছে উঠতে-না-উঠতেই গণ্ডক জাতের লোকেরা আক্রান্ত হোল। লুণ্ঠনকারীরা তাদের আক্রমণ করতে থাকল। বাকি কয়েকজন গণ্ডক জাতের লোক মৃত্যু ভয়ে আর্তনাদ করতে করতে সোজা অরণ্যপুরমের দিকে ধাবিত হোল।

শিলামুখীও কোন রকমে প্রাণে বেঁচে পেছন দিক থেকে তাড়া করতে থাকা লুণ্ঠনকারীদের কাছে ধরা না দিয়ে গাছের আড়াল দিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু লক্ষ্য করল লুণ্ঠনকারীরা তার পিছু ছাড়ছেনা। তাকে ঘিরে ফেলছে। তখন অগত্যা চিৎকার করে নিজের লোককে শিলামুখী বলল, "আর আমরা এই লুণ্ঠনকারীদের তাড়াতে পারবনা। অরণ্যপুরমের দিকে

এখন পালানোই শ্রেয়।" নিজের অনুচরদের বলল।

সেই সময় গাছের ডালের উপর থেকে গর্জন শোনা গেল, "মহামন্ত্রী শিলামুখী! পালিয়োনা। তোমার গণ্ডারটাকে পেছনদিকে ফেরাও। ঐ গণ্ডারটাকে তোমার পেছনে যে উট আসছে তার সাথে ভেড়াও। উটকে কাৎ করে ফেলতে পারে গণ্ডার। গণ্ডারের গুঁতো সহ্য করার মতো ক্ষমতা কোন জন্তুর নেই। ইন্দ্রের বজ্র আছে গণ্ডারের সিংএ। গণ্ডারের ক্লান্তি নেই।" কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেল শিলামুখী।

ঐ কণ্ঠস্বর শিলামুখীর চেনা। ঐ কণ্ঠস্বর তার দলের ক্ষত্রিয় যুবক স্বর্ণাচারির। কিন্তু ততক্ষণে শিলামুখীর মধ্যে পাল্টা আক্রমণ করার সামান্যতম সাহসও ছিলনা। ঐ কথা শুনে নিজের গণ্ডারটাকে আরও বেশি তাড়া দিয়ে নিজের অনুচরদের পেছনে পেছনে অরণ্যপুরমে পালিয়ে গেল মন্ত্রী শিলামুখী।

শিলামুখীকে উদ্দেশ্য করে স্বর্ণাচারি যা বলল তা লুণ্ঠনকারীদের নেতার কানে গেল। নেতা তৎক্ষণাৎ ভীষণ আগ্রহের সাথে ঐ গাছের নিচে গিয়ে বলল, "কে রে গাছে! আমার শত্রুকে কৌশল শেখাচ্ছে! আমি কে তা জান?" হুঙ্কার তুলে বলল নেতা।

"আমার নাম স্বর্ণাচারি। পদ্মপুরের শাস্ত্রজ্ঞ। আজন্ম বিনয়ী জন্তু উটকে দেখেই মহা পরাক্রমশালী জন্তু গণ্ডারকে ছুটতে দেখে প্রশংসা করতে পারলাম না। তাই শিলামুখীকে ঐ পরামর্শ দিয়েছি। আমার কাছে অবশ্য উষ্ট্রজাতের লোক আর ঐ গণ্ডকজাতের লোক সমান মিত্র।" বলল স্বর্ণাচারি গাছের ডালের উপর বসে।

"আচ্ছা, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার ঘটে বেশ বুদ্ধি আছে। এক্ষুণি গাছ থেকে নেমে আসবে না এই বল্লম ছুঁড়ে মারব?" বলতে বলতে লণ্ঠনকারীদের নেতা উটের উপর থেকে বল্লম উঁচিয়ে ধরল। (চলবে)

হেরম্বেশ্বর

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছে এল। আবার গাছে উঠে শব নাবাল। তাকে কাঁধে ফেলে আগের মতই পথ চলতে লাগল মৌনভাবে। কিছুক্ষণ পর শব থেকে বেতাল বলল, "মহারাজ একদিকে তোমার সংকল্প আমার কাছে যেমন অদ্ভুত ঠেকছে তেমনি অন্যদিকে এই সংকল্প হঠাৎ কবে শিথিল হয়ে যাবে ভাবছি। অমন যে বীণাবন্ত, ঈশ্বরের উপর যার অত ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তাকেইতো চোখের সামনে দেখলাম হঠাৎ নাস্তিক হয়ে গেল। তোমার হাঁটার পরিশ্রম লাঘর করার জন্য সেই ভক্তের নাস্তিক হবার গল্প বলছি শোন।"

বেতাল বলল: কলিঙ্গ দেশে বীণাবন্ত নামে এক বৈদ্য রোগীদের সেবা করত। উনি অনেক অদ্ভুত রকমের চিকিৎসা করে ধন্বন্তরি নামে অভিহিত হয়ে

বেতাল কথা–দ্বিতীয়

ছিলেন। উনি পরম শিবভক্ত ছিলেন। উনি প্রায় সব সময় শিবালয়ে থাকতেন। কী রাত্রে কী দিনে যারা ওঁর সাথে দেখা করতে চাইত তাঁরা ঐ শিব মন্দিরে গিয়ে ওকে ঠিক পেয়ে যেত।

বীণাবন্তের ঘরবাড়ি স্ত্রীপুত্র পরিবার যে ছিল না তা নয়। কিন্তু উনি নিজের বাড়িতে ছ-মাসে ন-মাসে যেত। সংসারের প্রতি তার কোন দিনই টান ছিলনা। একবার এক ধনী ব্যক্তিকে চিকিৎসা করে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলল। সেই ধনী ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা বশত তাঁর সাথে নিজের মেয়ে যশোধরার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, ওদের থাকার জন্য একটি বাড়িও তুলে দিয়েছিল।

স্ত্রীর পতি বীণাবন্তের টান যে ছিলনা তা নয়। তার সন্তানও হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পরও তার চরিত্রে তেমন কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। শিবালয়ে পড়ে থাকত রাতদিন। ওখানেই রুগীদের দেখত। অর্থও রোজগার হোত। কিন্তু টাকা বাড়িতে আসত না। শিব মন্দিরে গরীব শিবভক্তদের ঐ অর্থ দিয়ে দিত। মাঝে মাঝে স্ত্রী খবর পাঠাত: সংসার চালানো যাচ্ছেনা টাকার অভাবে। তখন বীণাবন্ত হাতে যে টাকা থাকত তা পাঠিয়ে দিত।

যশোধরা অভিমানী ছিল। মুখে কিছু বলত না। সংসারের সব কাজ নিজেই বিচার বিবেচনা করে সামলে নিত। কিন্তু কাঁহাতক আর একা বেচারা

সামাল দিতে পারে। তাই একদিন নিজের বাড়ি যশোবন্ত নামে এক ধনীর কাছে বিক্রী করে দিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হোল এত বড় যে একটা ঘটনা ঘটে গেল তাতে বীণাবন্তের মনে কোন চাঞ্চল্য ছিলনা।

যশোধরার কাছে যে যশোবন্ত বাড়ি কিনেছিল সে ছিল খুব নাস্তিক। কোন দেবতাকে প্রণাম না করেই সে অনেক টাকা রোজগার করেছিল। চিকিৎসার ক্ষেত্রে বীণাবন্তের হাতযশ যেমন ছিল ব্যবসার ক্ষেত্রে যশোবন্তেরও তেমনি হাতযশ ছিল।

যশোবন্তের দুই বউ একের পর এক মারা গেল। কোন বউএর একটাও বাচ্চা হোল না। ওর তৃতীয় বউ গর্ভবতী হোল। যশোবন্তের আনন্দের আর সীমা নেই। ওর বউ বলল, "ঈশ্বরের অশেষ করুণায় আমি মা হতে চলেছি।" ওর কথা শুনে যশোবন্ত বলল, "যা ইচ্ছে ভাবতে পার, বলতে পার, আমি কিন্তু ভগবানের করুণা-টরুণা বলে মনে করিনা।"

যশোবন্তের স্ত্রী নয় মাস পর এক পুত্র সন্তান প্রসব করল। কিন্তু ঐ সন্তান নড়ে না চড়ে না। ডাকে না কাঁদে না। যেন মৃত। চামড়া হাড়ডিসার দেহ। কিন্তু ওর বুকের উপর কান রেখে ভাল করে শুনলে টিপ টিপ শব্দ শোনা যায়।

"এই বাচ্চাকে একমাত্র বীণাবন্ত

ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারেনা।" বলল যশোবন্তের বন্ধুরা।

বীণাবন্তের প্রতি যশোবন্তের একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। লোকটা একটা আকাট। নিজের পরিবার দেখা-শোনার যার ক্ষমতা নেই সে আবার কেমনতরো মানুষ।

এই ধরনের মনোভাব থাকা সত্ত্বেও অনেক সাধ্য সাধনার পর যে সন্তান হোল তাকে বাঁচানোর আশায় বন্ধুদের কাছে যশোবন্ত বলল, "তাহলে ওকে এখানে ডেকে পাঠানো হোক।"

ওর বন্ধুরা শিবালয়ে গিয়ে বীণাবন্তকে সব বলে ওদের সাথে আসতে বলল।
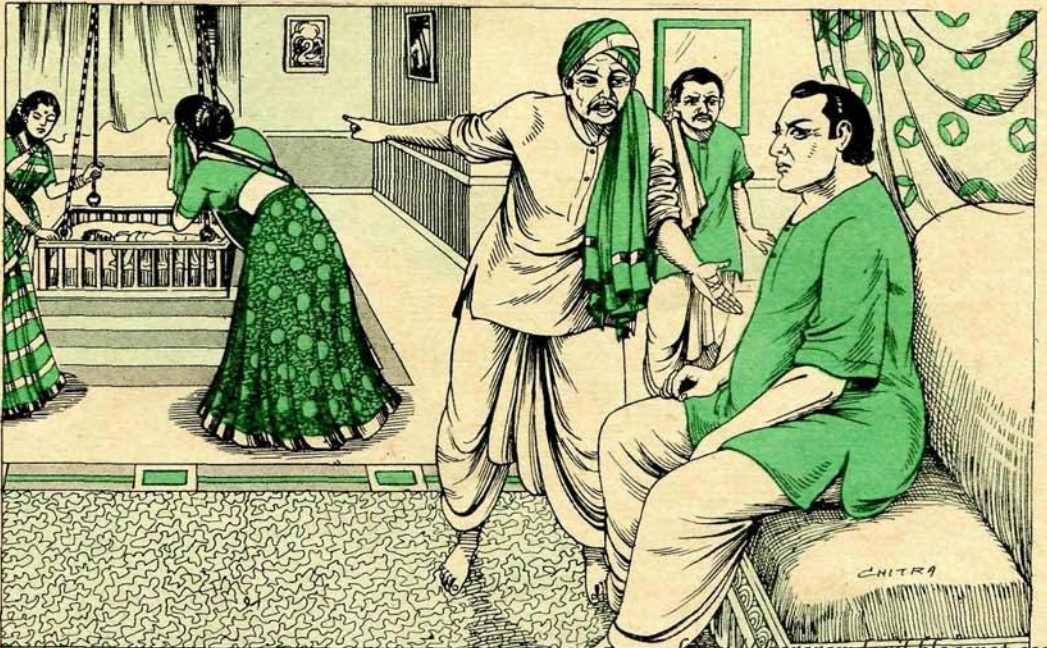
"ঐ নাস্তিকের কাছে আমি যাব না। ও এই শিবালয়ে এসে শিবলিঙ্গের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে অপরাধ স্বীকার করে নিলে ওর বাচ্চার চিকিৎসা করব। তারপর যা শিবের ইচ্ছা তাই হবে।" বলল বীণাবন্ত।

যশোবন্ত তার বাচ্চাকে নিয়ে শিবা-লয়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে বীণাবন্তের কাছে রেখে, শিবলিঙ্গের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। যশোবন্ত এসব করল নিতান্তই বীণাবন্তকে খুশী করার জন্য। শিবের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বা তার প্রতি বিশ্বাস থাকার জন্য নয়।

বীণাবন্ত তার থলে থেকে একটা বড়ি বের করে অল্প ভিজিয়ে বাচ্চার ঠোঁটে ঘষে দিল। তৎক্ষণাৎ বাচ্চাটা নড়ে চড়ে উঠে কাঁদতে শুরু করে দিল। এই ব্যাপার দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে যশোধরা তার কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শিবালয়ে এসে, "ওগো আমাদের বাচ্চা-টাকে বাঁচাও!" বলে কোলের বাচ্চাটাকে স্বামীর সামনে শুইয়ে দিল।

বীণাবন্ত বাচ্চাটার নাড়ি পরীক্ষা করে বাচ্চাটার মুখে একমাত্রা ওষুধ দিল। ঐ বাচ্চাটা একবার চোখ খুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণে মারা গেল।

বীণাবন্ত সটান শিবলিঙ্গের সামনে সাষ্টাঙ্গে পড়ে প্রণাম করে প্রার্থনা করল বাচ্চাটাকে বাঁচানোর। কিন্তু কোন ফল হোল না।

বীণাবন্ত তার ওষুধের পোঁটলা শিবলিঙ্গের মাথায় ছুঁড়ে কোথায় চলে গেল। আর কোনদিন মন্দিরের ত্রিসীমানায় পা রাখেনি। অনেকদিন পর শিবের বাৎসরিক উৎসবের দিনে এসে শিবের উপর দূর থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। সবাই ভাবল বীণাবন্ত পাগল হয়ে গেছে।

বেতাল এই গল্প বলে বলল, "রাজা, পরমভক্ত বীণাবন্ত বেশ তো ছিল কিন্তু হঠাৎ চরম নাস্তিক হয়ে গেল কেন? আর চরম নাস্তিক যশোবন্ত রাতারাতি পরমভক্ত হয়ে গেল কেন? মানুষ যে ভগবানকে বিশ্বাস করে সেটা কি শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষার্থেই? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না বল তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

ঐ কথা শুনে বিক্রমাদিত্য বলল, "মানুষ স্বার্থ ছাড়া কিছু বিশ্বাস করেনা। যশোবন্তের সন্তান বেঁচে গেছে বলেই সে ভগবানের ভক্ত হয়েছে। ঠিক ঐ ধরনের স্বার্থের কারণেই বীণাবন্তও ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে ছিল। নিজের ওষুধের উপর তার কোন দিনই বিশ্বাস ছিল না। উনি বরাবর নিজের নিমিত্ত ভাবতেন। ওঁর ওষুধে কিছু হয়না। যা করেন ভগবান করেন। এত গভীর বিশ্বাসের জন্যই নিজের সন্তান মারা যাওয়াতে অমন চট করে সেই বিশ্বাস উবে গেল। চিকিৎসার ত্রুটির জন্যই যে সন্তান মারা গেছে সে কথা বীণাবন্ত ভাবতে পারেন নি। ভেবেছেন শিব মেরে ফেলেছেন। এইভাবে রুগী এবং ওষুধের মধ্যে শিবকে শিখণ্ডী রাখার ফলেই তার অত বড় চিকিৎসা করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে পাগল হল।

রাজার মুখ খুলতেই বেতাল শবসহ পালিয়ে গিয়ে উঠে বসল সেই গাছে।

(কল্পিত)

স্বর্গ প্রাপ্তী

স্বর্গ মর্ত পাতাল এই তিন লোকেই ঘুরে বেড়ায় নারদ। একবার শ্মশানের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তার নজরে পড়ল মানুষের একটা খুলি। নিজের পিতা ব্রহ্মার হাতের লেখা সে চেনে। সেই খুলিতে তাঁর হাতের লেখায় আছে : স্বর্গ প্রাপ্তি হবে। নারদ খুব আশ্চর্য হোল।

নারদ দিব্য দৃষ্টিতে জানতে পারল সেই খুলি এক কাঙ্গালের। সারা জীবন সে গরীব ছিল। জীবনে এক পয়সা কাউকে দান করতে পারেনি। কোন মন্দির গড়তে পারেনি। সেই লোকের কি করে যে 'স্বর্গ প্রাপ্তি হবে' নারদ ভেবে পায়না। ভাবল ব্রহ্মার ভুল হয়ে গেছে।

ব্যাপারটাকে জানার জন্য নারদ ঐ খুলি নিয়ে ব্রহ্মলোকে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলো ব্রহ্মাকে, "পিতা, এই খুলি যার সে জীবনে যখন পুণ্য কাজ করেনি তার 'স্বর্গ প্রাপ্তি হবে' কি করে ? এই অসত্য কথা লিখলেন কেন ?"

"অসত্য কি করে হোল বৎস ? এই খুলিকে তুমি নিজেই তো এইলোকে হাতে করে নিয়ে এলে।" বললেন ব্রহ্মা।

গৌতম গুহ

কোন এক গ্রামে হাজার বছর আগে এক মহাশিল্পী ছিল। ঐ শিল্পীর রূপরেখা অনুসারে বহু বাড়ি, ভবন, মন্দির, মহল গঠিত হোত। ওর খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

ঐ সময়ে নাগলোকে নাগরাজার ভবনে ভূমিকম্পের ফলে চিড় ধরল। সেটা নতুন করে গড়ে তোলার জন্য মর্তভূমি থেকে ঐ মহাশিল্পীকে ডেকে পাঠালে নাগরাজ। নাগরাজের আহবান শুনে এক নতুন ধরণের ভবন গড়ার আশায় ঐ মহাশিল্পী নাগলোকের দিকে রওনা হোল।

অল্প সময়ের মধ্যে নাগরাজের সাথে মহাশিল্পীর সম্পর্ক জমে উঠল। তার কোন কিছুরই অভাব হোতনা। তবুও মহাশিল্পীর মন পড়ে থাকত তার বাড়িতে। তার সাধারণ বাড়ির কথা, তার মায়ের কথা ভাবত। স্ত্রীর কথাও ভাবত। কেমন আছে। কি করছে ইত্যাদি।

একদিন মহাশিল্পী নাগরাজকে বলল, "রাজা, আমার মন বাড়িতে পড়ে আছে। আমার বাড়ির, আমার গ্রামের অবস্থা কেমন আছে জানাবেন ?"

"সত্য গোপন করব না। তোমার গ্রামের দিকে কিছুকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছেনা। ওখানে এখন ভয়ঙ্কর আকাল।" বলল নাগরাজ।

"তাহলে ওখানে বৃষ্টি ঝরাতে পারেন না ?" বলল শিল্পী।

"তা কিছুতেই হতে পারেনা। ঐ ভাবে বৃষ্টি ঝরানো নিয়ম বিরুদ্ধ। কবে যে কোথায় আকাল হবে তা আগে থেকে ঠিক করা থাকে। এই আকালের খেলা ওখানে আমাকে আরও নিরানব্বই দিন চালিয়ে যেতে হবে।" বলল নাগরাজ।

শিল্পীর মেজাজ বিগড়ে গেল। তার

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

চোখের সামনে সব সময় ভাসতে লাগল তার গ্রামের হাহাকারের ছবি, তার মা, তার বউ, তার বন্ধু বান্ধব সবাই না খেতে পেয়ে ধুঁকছে। এক একদিন মাঝ রাতে শিল্পী দেখতে পেত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন ঃ তার প্রিয়জন মারা যাচ্ছে। গাছের ডালে একটি পাতাও নেই।

"নাগরাজ, তোমার কাছে কাতর-ভাবে প্রার্থনা করছি, আমার গ্রামে বৃষ্টি দাও। আমার গ্রামের মানুষ না খেতে পেয়ে ছটফট করে মারা যাচ্ছে। আমার পরিবারের লোক মারা যাবে। আমার কথা শোন নাগরাজ।" মহাশিল্পী বলল।

"ওরে হরবোলা, তোমার কী দরকার এখন ওদের কথা ভেবে! আর তা ছাড়া আমার ভবন তৈরি করে ফেললেই তো তোমাকে অনেক পুরস্কার দেব। অনেক জমি দেব, সোনা রূপা দেব অনেক। তুমি যতদিন বাঁচবে মহারাজার মতো কাল যাপন করতে পারবে।" বলল নাগরাজ।

"আমি চাই আমার গ্রামে বৃষ্টি। তোমার পরিবারের লোক যদি এভাবে হাহাকার করত তখন তুমি পারতে নিশ্চিন্তে কাজ করতে ?" বলল শিল্পী।

"আমাকে অহেতুক বিরক্ত করনা। এখন বৃষ্টি হবেনা। এই শেষ কথা।" বলে নাগরাজ উঠে পড়ল।

মহাশিল্পী বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তৈরি হোল। থাকল পড়ে ভবনের কাজ।

এ কথা কানে যেতেই নাগরাজ ছুটে এসে বলল, "অহেতুক এই অভিমানের কারণ কি ?"

অহেতুক নয় নাগরাজ। আমি গ্রামে ফিরে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসতে চাই প্রকৃত অবস্থা।" শিল্পী বলল।

"এই, কে আছিস। বন্দী কর এই দুরাত্মাকে।" বলল নাগরাজ। পরক্ষণেই নাগ সেবকেরা শিল্পীকে ঘিরে ফেলল।

"এখন বল আমার ভবন গড়ে তুলে যাবে কিনা ?" নাগরাজ জিজ্ঞেস করল।

"আমার গ্রামে বৃষ্টি ঝরাবে কিনা ?"

জিজ্ঞেস করল মহাশিল্পী।

"বৃষ্টি ঝরাবোনা বলে তোমাকে আগেই বলেছি।" বলল নাগরাজ।

"তাই যদি হয় তাহলে আমিও ভবন তৈরির কাজ করবনা।" বলল শিল্পী।

"ওরে, একে নিয়ে গিয়ে শিরচ্ছেদ···" হঠাৎ নাগরাজ থেমে গেল। মহাশিল্পীর শিরচ্ছেদ করলে তাকে দিয়ে আর ভবন তৈরি হবে কি করে! একথা মনে জাগতেই নাগরাজ বলল, "শিল্পীকে ছেড়ে দাও।" নাগরাজ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

তাকে ছাড়লো বটে কিন্তু নাগলোক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন ক্ষমতা শিল্পীর রইল না। শিল্পীর চোখের সামনে থেকে নিজের গ্রামের করুণ চিত্র আর কিছুতেই সরছে না। রাতদিন গ্রামের কথা ভাবতে লাগল মহাশিল্পী। এক জায়গায় বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটা থামের উপর।

শিল্পী তৎক্ষণাৎ উঠে একটা করাত দিয়ে ঐ থাম কাটতে লাগল। থাম যত কাটা পড়ছে ভবন ততই টলছে। নাগ-রাজ হাঁকপাক করতে করতে এসে বলল, "আহা, করকি! করকি! থাম" বলে চিৎকার করতে লাগল।

"বৃষ্টি ঝরাবে বল?" শিল্পীর প্রশ্ন।

"বৃষ্টি ঝরাবো, বৃষ্টি হবে, কথা

দিচ্ছি।" বলল নাগরাজ।

"হরিণপুরে গিয়ে অধিক বৃষ্টি ঝরিয়ে বন্যার সৃষ্টি করেছে। আমাদের গ্রামে ওসব করলে চলবেনা। ঠিক যতটা বৃষ্টি প্রয়োজন ততটাই ঝরাতে হবে। মনে থাকে যেন।" বলল মহাশিল্পী।

"তুমি যা চাইছ তাই হবে।" বলল, নাগরাজ! বিরাট বিরাট ভবন যে শিল্পী বানাতে পারে তার পক্ষে কোন ভবন ভাঙ্গাতো আর কষ্টকর ব্যাপার নয়।

"তুমি যদি ঠিক বৃষ্টি ঝরাও তাহলে আমি এমন ভবন বানিয়ে দেব যা দেখে স্বয়ং ইন্দ্রও অবাক হয়ে যাবে। ঈর্ষাণ্বিত হবে।" বলল মহাশিল্পী।

নাগরাজ শিল্পীর শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে বলল, "তুমি এক্ষুণি গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসো ওখানে বৃষ্টি পড়ছে কি না।"

শিল্পী ভূলোকে এলো। দেখলো তার গ্রামে বৃষ্টি পড়ছে। গ্রামবাসীরা আনন্দে বিভোর। কিন্তু গ্রামের মানুষ তাকে দেখতে পায়নি। গ্রামবাসীদের নজরে পড়ল এক বিরাটকায় সর্প।

"এই সাপই আমাদের গ্রামে বৃষ্টি আনল। এর জন্য আমরা একটা মন্দির গড়ে তুলি।" ওরা বলল। অল্পদিনের মধ্যেই মন্দির গড়ে উঠল। গ্রামের আকাল দূর হোল।

শিল্পী নাগলোক ফিরে গিয়ে নাগরাজকে বলল, "আমাকে যাদুকরে সাপ বানিয়ে ভূলোকে পাঠালে। স্বজনদের দেখছি, ওদের সাথে কথা বলতে পারলাম না।"

"তুমি খুব চতুর লোক। সেইজন্য আমি তোমার ব্যাপারে সাবধান হয়ে যা করার করেছি। আমার কথা আমি রেখেছি। এখন তোমার কথা তুমি রাখ।" বলল নাগরাজ।

শিল্পী নাগরাজের ভবনটিকে চমৎকার করে গড়ে তুলল। ইন্দ্র গৃহপ্রবেশের দিন এসে সেই ভবন দেখে সত্যি ঈর্ষাবোধ করল। নাগরাজ শিল্পীকে অনেক উপহার দিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

মহাশিল্পীকে যারা চিনতো তারা ওকে দেখে বলে উঠল, "আরে, এতদিন তুমি ছিলে কোথায়? তোমার না থাকার সময় এখানে ভীষণ আকাল পড়েছিল। এক সর্পদেবতা এসে এখানে বৃষ্টি ঝরিয়েছে। ঐ সাপের জন্য মন্দিরও গড়ে তুলেছি।"

"আমিই সেই সাপ।" বলল শিল্পী। অনেকেই ওর কথা বিশ্বাস করল না। পরে ঐ শিল্পী গ্রামের সবাইকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলল। তখন গ্রামবাসী তার কথা বিশ্বাস করল এবং সে যে উপকার করেছে তা বুঝে তার প্রশংসা করল, নিজেরাও গর্ববোধ করল।

তারপর থেকে সেই গ্রামের নাম হোল সর্পপুর।
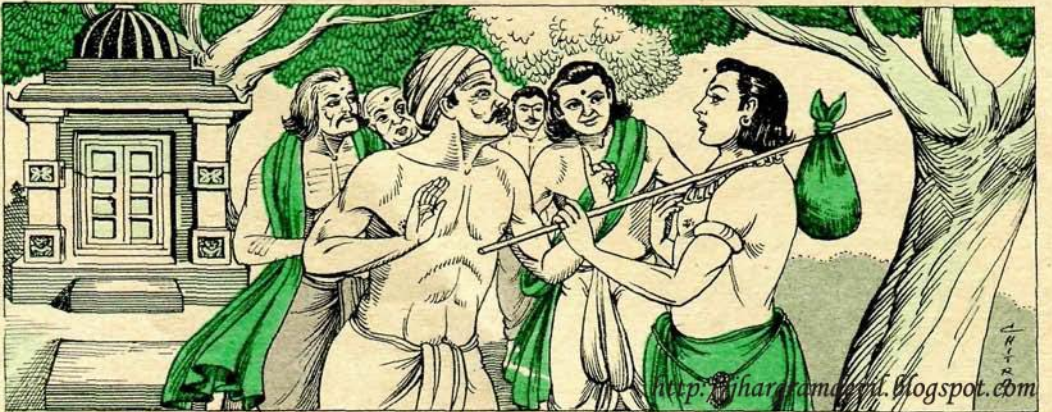
খেয়ালী রাজা

গৌড় দেশে দেববর্মা নামে এক রাজা ছিল। ঐ রাজা যেমন ছিল মূর্খ তেমনি খেয়ালী। যখন যা ইচ্ছে করত।

দেববর্মার দর্শন প্রার্থী হয়ে একদিন এক নকল সাধু এলো। বিরাট দাড়ি আর মাথায় গোছাকরে জটা বাঁধা। রাজাকে ঐ সাধু বলল, "মহারাজ, আপনি অনেক বছর ধরে আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ করতে পারছেন না। তার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন। কী আপনার ইচ্ছা? আমার তপস্যা শক্তি বলে পারলে আপনার ঐ ইচ্ছা পূরণ করার উপায় বলে দেব।"

তৎক্ষণাৎ দেববর্মা বলল, "হে মান্য-বর সাধু, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি রাজা হয়েও ঠিক রাজ চক্রবর্তী হতে পারছিনা। এটাই আমার বড় অনুতাপ। আপনি কি এর কোন বিহিত করতে পারেন?" রাজা জিজ্ঞেস করল।

নকল সাধু গভীর ভাবে চিন্তা করার মত কিছুক্ষণ অভিনয় করে রাজাকে বলল, "আপনি যা ভাবছেন তা মিথ্যা নাও হতে পারে। আপনার ঠিকুজি-কোষ্ঠি একবার দেখাবেন?"

রাজা রাজজ্যোতিষীকে তার কোষ্ঠী সাধুকে দেখাতে বলল।

সাধু কোষ্ঠী দেখে বলল, "ইস্ কুড়ি বছর আগে আপনার ইচ্ছা পূরণের সুযোগ একেবারে কান ঘেঁসে চলে গেছে। তখন যদি গ্রহশান্তি করানো যেতো তাহলে অবশ্যই আপনার ইচ্ছা পূরণ হোত। এ-খ-ন-ও সে সুযোগ যে চলে গেছে তা নয়। কিন্তু আরও এইভাবে আপনাকে কুড়িটি বছর কাটাতে হবে। তারপর দেখবেন আপনার সব ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাচ্ছে।" সাধু বলল।

খেয়ালী রাজা সাধুর কথায় খুব খুশী

অনুরাধা দেবী

হয়ে নকল সাধুকে অনেক অর্থ দিয়ে বিদায় করল।

সেই থেকে ঐ রাজ চক্রবর্তী বা সম্রাট হবার ইচ্ছা প্রবলতর হতে লাগল। রাজা ডেকে পাঠাল সমস্ত জ্যোতিষীকে। বলল, "কাল থেকে সমগ্র দেশের পাঁজি কুড়ি বছর এগিয়ে দিয়ে নতুন পাঁজি তৈরি করুন। এই নতুন পাঁজিতে তিথি, বার, নক্ষত্র সবই কুড়ি বছর এগিয়ে থাকবে!"

জ্যোতিষীদের তো মাথায় হাত। কি করবে ভেবে পায়না। শেষে ওরা মন্ত্রীর কাছে গিয়ে সব বলল।

মন্ত্রী রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ,আপনি পাঁজি কুড়ি বছর এগিয়ে দিতে বললেন? তার ফলে যে জটিলতা দেখা দেবে আপনি হয়তো ভাবেননি।"

"জটিলতা আবার কিসের?" রাজা জিজ্ঞেস করল।

"আপনার বয়স এখন চল্লিশ বছর। নতুন পাঁজি করলে আপনার বয়স হবে ষাট বছর। যুবরাজের বয়স হবে পঁচিশ। তখন তাকে সিংহাসনে বসিয়ে আপনাকে যেতে হবে বানপ্রস্থে।" মন্ত্রী বলল।

রাজা বলল "তাহলে তো বড় গোল-মাল। একটা কাজ করি। কুড়ি বছর পেছিয়ে দিয়ে নতুন পাঁজি তৈরি করাব। তাড়াতাড়ি গ্রহশান্তি করিয়ে আমি সম্রাট হয়ে যাব।"

"তাতে আরও বেশি করে জটিলতা দেখা দেবে। সিংহাসনে বসার অধিকার আপনার থাকবেনা। আপনার পিতা এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছেন। কুড়ি বছর পেছিয়ে দিলে উনি কি আর সিংহাসন ছাড়বেন?" মন্ত্রী প্রশ্ন করল।

রাজা ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, "না! না!" জ্যোতিষীদের তক্ষুণি ডেকে পাঠিয়ে, "আপনাদের মধ্যে কেউ কুড়ি বছর এগিয়ে অথবা কুড়ি বছর পেছিয়ে পাঁজি তৈরি করার কথা যদি ভাবেন তাহলে তাঁর শিরচ্ছেদ করা হবে।" রাজা সোচ্চারে ঘোষণা করে দিলেন।

স্বামীর খোঁজে

সেকালের কথা। উজ্জয়িনী নগরে সাগর দত্ত নামে এক ব্যবসায়ী ছিল। তার কাছে ছিল অগাধ সম্পত্তি। একবার জাহাজে ব্যবসা করতে বেরিয়ে মাঝ সমুদ্রে দেখল আর এক ব্যবসায়ীর জাহাজ। জাহাজের মালিক হোল রাজগৃহ নামক নগরের ব্যবসাদার বুদ্ধবর্মা।

সাগরদত্ত এবং বুদ্ধবর্মার মাঝে সেদিন থেকে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। কথায় কথায় তারা এক মজার শর্ত করে ফেলল। একজনের ছেলে আর অন্য জনের যদি মেয়ে হয় তাহলে তারা ঐ ছেলে মেয়ের বিয়ে দেবে।

সাগরদত্ত দেশান্তরের ব্যবসা সেরে বাড়ি ফিরতেই মল্লিকা ফুলের মালা পরিয়ে একটি মেয়েকে তার কোলে দেওয়া হোল।

"এ কার মল্লিকা ?" সাগরদত্ত স্ত্রীকে প্রশ্ন করল।

সাগরদত্তের স্ত্রী সলজ্জভাবে বলল, "আপনার কন্যা।"

মেয়ের নাম রাখা হয়েছে মল্লিকা। সাগরদত্ত বুদ্ধবর্মার সাথে যে শর্ত হয়েছে তা স্ত্রীকে জানাল। তারপর রাজগৃহ নিবাসী বুদ্ধবর্মার কাছেও খবর পাঠাল।

বুদ্ধবর্মা যখন ব্যবসার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল তার স্ত্রী তখন গর্ভবতী। সেইজন্য বুদ্ধবর্মা বাড়ি ফিরেই বলল, "আমাদের ছেলে হয়েছে না মেয়ে ?" বুদ্ধবর্মার স্ত্রী শিশুকে এনে তার সামনে রাখল। শিশুটির চেহারা হাড্ডিসার। একটি মাত্র চোখ দিয়ে দেখছে। আর কুঁজো।

"তুমি এই উটের জন্ম দিলে !" বুদ্ধবর্মা স্ত্রীর উপর রেগে গিয়ে বলল। বাবা যেহেতু উট নামে ডাকল অতএব তার

রীণা ভট্টাচার্য্য

মেলে। কোন অবস্থাতেই সাগরদত্তের সাথে আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন করা উচিত নয়।" বুদ্ধবর্মার স্ত্রী বুঝিয়ে বলল।

স্ত্রীর কাছে শোনা কথাই সাগরদত্তের দূতকে জানিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল।

তারপর আট বছর ধরে রাজগৃহ এবং উজ্জয়িনীর মধ্যে দূতের যাতায়াত চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন সাগর-দত্তের দূত রাজগৃহ গিয়ে বুদ্ধবর্মাকে বলল, "মহাশয়, আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনার ছেলের রূপ এবং গুণের পরিচয় জেনে যাওয়ার।

বুদ্ধবর্মা নিঃসঙ্কোচে বলল, "আমার পুত্র তার মামার বাড়ি তাম্রলিপ্তে লেখা-পড়া করতে গেছে।"

নামও হয়ে গেল উট।

ঠিক এমন সময় বুদ্ধবর্মা সাগরদত্তের মেয়ে হওয়ার খবর পেল। এই খবর যারা আনল তাদের আদর আপ্যায়ন করে বুদ্ধবর্মা স্ত্রীকে বলল, "দেখলে তো, কি হতে কি হয়ে গেল। এখন আমি কি সংবাদ পাঠাব ?"

"জিজ্ঞেস করলেন যখন বলছি, ব্যবসাদার মাত্রেই নিজের স্বার্থে কখন সত্য আবার কখনও মিথ্যা কথা বলে থাকে। আমাদেরও ছেলে হয়েছে বলে খবর পাঠিয়ে দিন। আর এতো মিথ্যে নয়। আর বলে দিন যে তার চেহারা বর্ণনাতীত। রূপে গুণে তার পরিচয়

এভাবে নানান বায়নাক্কায় আরও চার বছর কেটে গেল। একবার সাগরদত্তের চার পাঁচজন অনুচর বুদ্ধবর্মার কাছে এসে বলল, "মহাশয়, আপনার বন্ধু সাগরদত্ত এবং তাঁর স্ত্রী বলে পাঠালেন যে বার চৌদ্দ বছর হতে চলল তবু তারা তাদের ভাবী জামাইকে দেখতে কেমন তা জানতে পারল না। পাত্র না দেখে দেনা-পাওনার কথাবার্তা হবে কি করে। আজও আপনার ছেলে তাম্রলিপ্তে পড়াশুনা করছে এটা ভাবতে কেমন লাগে। তাই, এসব টালবাহানা ছেড়ে

ছেলেকে দেখানোর ব্যবস্থা করুন।

"ভাইসব, তোমরা বিশ্রাম কর।" দূতদের এই কথা বলে বুদ্ধ স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল, "দূতেরা আমাদের ছেলেকে দেখার জিদ ধরেছে যে! আমাদের এই উঁচু দাঁত, অন্ধ চোখ আর বেঢপ চেহারার কুঁজো ছেলেকে দেখাই কি করে? এখন তোমাকেই আবার উপায় ভাবতে হবে।"

"আমি কবে উপায় ভেবে রেখেছি।" এই কথা বলে বুদ্ধবর্মার স্ত্রী নিজের ভেবে বের করা উপায় বলে দিল।

বুদ্ধবর্মার খরচে জীবন যাপনকারী একটা ব্রাহ্মণ ছিল। বুদ্ধবর্মা গোপনে তার বাড়ি গিয়ে তাকে নিজের সমস্যা জানিয়ে বলল, "প্রিয়বর, এখন তোমার সাহায্য ছাড়া আমার মান সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে। তোমার ছেলে যজ্ঞগুপ্ত দেখতে যেমন সুন্দর সমস্ত শাস্ত্রে ও তেমনি বিজ্ঞ। আমার পুত্রের পরিবর্তে তোমার ছেলেকেই সাগরদত্তের কন্যার সাথে বিয়ে করতে হবে এবং তার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই আমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। আমার এই কথায় রাজী হলে বিয়েতে পণ এবং জিনিসপত্র যা পাব তার অর্দ্ধেক তোমাকে দেব।"

"মশাই, আপনার ইচ্ছা পূরণ করা আমার কর্তব্য। আপনি ভাববেন না।"
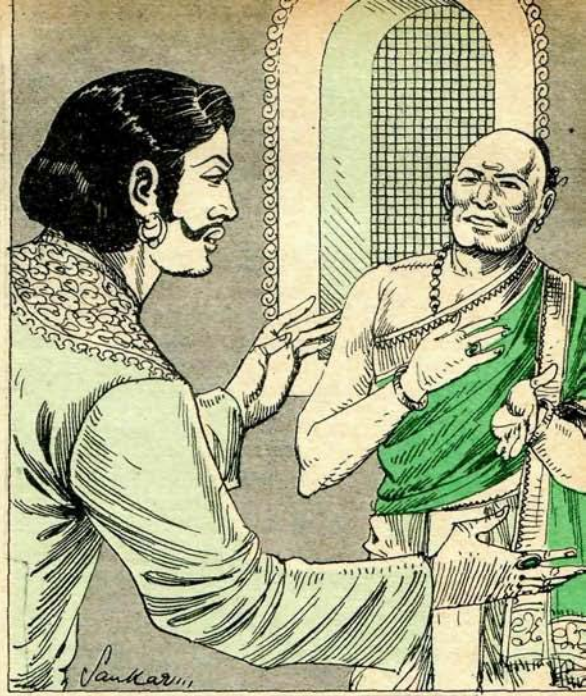
এই কথা বলে নিজের ছেলেকে ডেকে সব কিছু বুঝিয়ে দিল।

"আপনি আমার শুধু পিতা নন গুরুও। তাই আপনার আদেশের দোষ-গুণের বিচার করা আমার উচিত নয়।" বলে যজ্ঞগুপ্ত নিজের সম্মতি জানাল।

দু'একদিন কেটে যাওয়ার পর বুদ্ধ-বর্মা সাগরদত্তের দুতদের বলল, "আমার ছেলে তাম্রলিপ্ত থেকে ফিরেছে।" তারপর যজ্ঞগুপ্তকে এনে সাগরদত্তের দূতকে দেখিয়ে দিলো। দূতেরা ভাবলো মল্লিকা খুব সৌভাগ্যশালিনী। ওরা বুদ্ধবর্মাকে বলল, যে কোন শুভ মুহূর্ত দেখে বিয়ে করাতে ছেলেকে সাগরদত্তের

বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। খুশী মেজাজে দূতেরা ফিরে গেল কথাবার্তা সেরে।

দু'চার দিন পরে বুদ্ধবর্মা যজ্ঞগুপ্তকে বর সাজিয়ে আর নিজের ছেলেকে ব্রাহ্মণ সাজিয়ে পরিবারের কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিল উজ্জয়িনী।

পরের দিন সকালেই বিয়ের কাজ হয়ে গেল। বরকনে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করার সময় হঠাৎ বর এমন ভাবে পড়ে গেল দর্শকরা যাতে মনে করে যে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কোন এক অশুভ ইঙ্গিত ভেবে কন্যাপক্ষ ঘাবড়ে গেল। ছোটাছুটি পড়ে গেল। অনেকক্ষণ পর বর বিড় বিড় করে আধ বোজা চোখে বলল, "আমার ভীষণ পেট ব্যথা করছে।"

বৈদ্যরা বরকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করল। কনে কোন রকমে সঙ্কোচ না করে বৈদ্যদের কথামত বরের সেবা করতে লাগল। ঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়াতে লাগল। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও বরের পেটের ব্যথা সারেনি।

কুঁজো ছেলেটাও বরের পাশে বসে থাকা কনের সাথে ঠাট্টা করতে লাগল। এসব দেখে মল্লিকা রেগে গেল। তখন যজ্ঞগুপ্ত বলল, "ও ঠাট্টা করছে, তুমি অত চটছ কেন? ওকে বকতে দাও"

কিন্তু যজ্ঞগুপ্তের মনে একটা ভয় সব সময় ছিল, সেই কুঁজোটা সমস্ত গোপন ব্যাপার ফাঁক না করে দেয়। সাগরদত্তের কাছে বলল, "আমার

বাবামাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।”

বৈদ্য বরের ইচ্ছা জানতে পেরে সাগরদত্তকে বলল, “বদহজমের সমস্ত রকম ওষুধ আমি দিয়েছি কিন্তু কোন ফল হোলনা। বর নিজের বাপ-মার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করলে হয়ত এই রোগ সেরে যাবে। তাই যত শীঘ্র সম্ভব একে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।” সাগরদত্ত নিজের কন্যা এবং জামাইয়ের যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিল। যৌতুকের জিনিস উটের পিঠে চাপানো হয়। দাসদাসী ও দেহরক্ষী সহ বর-কনেকে রাজগৃহ পাঠানো হোল। সাগর-দত্তের চাকররা ওদের আগে রওনা হয়ে রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে লাগল। বরকনে সহ যেতে যেতে মাঝে মাঝে বরের স্বাস্থ্যের খবর সাগরদত্তের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও ছিল।

রাজগৃহের দিকে যত এগোতে থাকে বরের স্বাস্থ্য তত ভাল হতে থাকে। রাজগৃহে পৌঁছাতেই তার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। এই সুস্থ হবার খবর পেয়ে সাগরদত্তের মন আনন্দে ভরে উঠল। তখন সে গরিবদের মধ্যে অনেক কিছু বন্টন করে দিল।

বুদ্ধবর্মা বধূকে দেখে খুব খুশী হোল। রাতে বর আর বধূকে ফুলশয্যার ঘরে পাঠানো হোল। ঐ ঘরে মল্লিকার সাথে আসা তার বান্ধবীরা এবং কুঁজোটাও ছিল।

মল্লিকা ভাবল, এই কূঁজোটা এই ঘরে কেন আছে ?

কুঁজোটাও মনে মনে ভাবল, এই ব্রাহ্মণের বাচ্চাটা এখনও বসে আছে কেন ? কুঁজোটা বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকলো তার প্রতি। অবস্থা বুঝে যজ্ঞ-গুপ্ত সেখান থেকে চলে যাওয়ার উদ্দেশে উঠে দাঁড়াল।

তৎক্ষণাৎ মল্লিকা যেন আর্তনাদ করে করে উঠে বলল, "একি, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? আমার অবস্থা কি হবে ?"

"ভাগ্যদেবতা তোমার কপালে যে পতি লিখে রেখেছেন তুমি সেই পতির সাথেই জীবন যাপন করবে। মাঝখানে আমিই শুধু পাপের ভাগী হলাম।" বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল। মল্লিকার সাথীরাও অগত্যা বাইরে চলে গেল।

এই অবস্থা দেখে মল্লিকাও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল। হঠাৎ কুঁজো লোকটা তাকে ধরে ফেলল। মল্লিকা আর্তনাদ করে ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। এক এক করে সেই বিরাট বাড়ির প্রায় প্রত্যেক ঘর পেরিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। প্রত্যেকটা ঘরের লোক যেন নেশায় ক্লান্তিতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিছু দাসদাসী এক জায়গায় নাচছে।

মল্লিকা বাড়ির বাইরে এসে কাকে যেন দেখে "ঐ যো, ঐ যো", বলতে বলতে তার পিছু পিছু ছুটতে থাকে। সে যে কোথায় ছুটে চলেছে সে নিজেই তা জানেনা। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পথের ধারে নজরে পড়ল এক কাপালিক নেশায় যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

মল্লিকা তৎক্ষণাৎ নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলল। সে নিজের গয়নাগাঁটি পোঁটলা বেঁধে কোমরে গুজে নিল। কাপালিকের পোষাক খুলে নিয়ে সেই পোষাক নিজে পরে মাতালের মত টলতে টলতে বকতে বকতে রাজগৃহ নগর পেরিয়ে একটি গ্রামের দিকে রওনা দিল।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

বুদ্ধির জোর

উত্তরদেশের একটি গ্রামে বীরসিংহ ও জ্ঞানপ্রকাশ নামে দুজন যুবক ছিল। ওদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু স্বভাবে ওরা ছিল পরস্পরের বিপরীত। জ্ঞানপ্রকাশ ছিল রোগা, দুর্বল কিন্তু তার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। আর বীরসিংহ ছিল শক্তিশালী, সাহসী আর তড়িঘড়ি করে কাজ করা লোক। ওর বুদ্ধি ছিল কম। দুজনেই গরীব পরিবারের।

দুই বন্ধুতে একবার দূরের গ্রামে রওনা হোল। মাঝ পথে বীরসিংহের খিদে পেল। দূরে একটি গ্রাম দেখতে পেল। সেখানে গিয়ে কাউকে খেতে দিতে বলব বলল বীরসিংহ।

"আমার অত খিদে নেই। গ্রাম দেখে মনে হচ্ছে এখানে গরীব মানুষই বেশি আছে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ কারো বাড়ি যেতে ভাল লাগে না। আর তা ছাড়া আমরা দুজনে গেলে খেতে পাব কিনা সন্দেহ। তুমি আগে গিয়ে খেয়ে এসো। তারপর দেখা যাবে।" বলল জ্ঞানপ্রকাশ।

আসল ব্যাপার হোল যা-তা ব্যবহার করে বীরসিংহ সবার সাথে ঝগড়া করে। আর খিদে পেলে ওর কোন জ্ঞান থাকেনা। বুদ্ধি খেলেনা। একথা জ্ঞান-প্রকাশ ভালভাবেই জানত। ওর সাথে গেলে ভাত তো দূরের কথা জলও খেতে পাবেনা। সেই জন্যই বীরসিংহকে একাই যেতে বলল গ্রামে।

গাঁয়ে ঢুকেই এক চাষীকে দেখতে পেল বসে খাচ্ছে। ক্ষেতে যাওয়ার আগে খেতে বসেছে। বীরসিংহ হঠাৎ তার বাড়িতে ঢুকে বলল, "আমার খিদে পেয়েছে, আমাকেও খেতে দাও।" জোর করে যেন দাবি করছে সে।

নেপাল নাগ
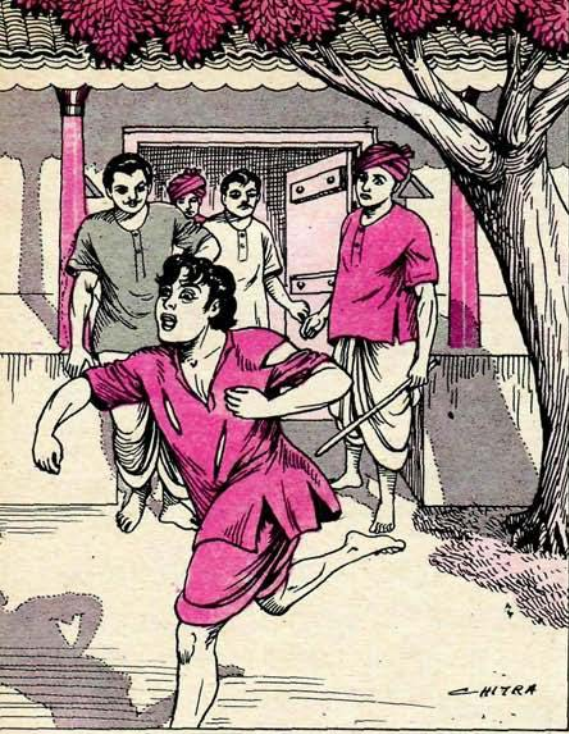
চাষী আর চাষী-বউ লোকটার চোট-পাট দেখেতো অবাক!

"হাঁ করে দেখছ কি? তোমাদেরই বলছি। তাড়াতাড়ি খেতে দাও।" বীর-সিংহ দুমদাম করে বলল। এমন ভাবে বলল যেন ওদের কাছে তার বলার অধিকার আছে!

"তোমার এতো মেজাজ কিসের? তোমাকে আমরা খেতে দেব কেন? তুমি কি আমাদের আত্মীয়? যাও, ভাগ এখান থেকে।" বলল চাষী।

"খেতে দেবে কিনা জানতে চাই। আমার হাতের লাঠিটা দেখছো তো!" বলল বীরসিংহ।

ওরা দুজনে এই ধরনের কথা বলা-বলি করছে এমন সময় চাষীর বউ খিড়কীর দরজা দিয়ে পাড়ায় বেরিয়ে দশ বারোজনকে ডেকে আনল।

বীরসিংহ লাঠি মারার কথা বলতে না বলতে তার পিঠেই কয়েকটা লাঠির ঘা পড়ল। বীরসিংহ আর্তনাদ করতে করতে ছুটছে তো ছুটছে। শেষে জ্ঞানপ্রকাশের কাছে পৌঁছে গেল। ওর অবস্থা দেখে ওর কাছে সব কথা শুনে সে বীরসিংহকে বলল, "তুমি ঘন্টাখানেক এই গাছের নিচে বস। আমি এক ঘন্টার মধ্যে খাবার আনব। তুমিও খাবে আমিও খাব।"

এবারে জ্ঞানপ্রকাশ সেই কিষাণের বাড়ি গেল। বীরসিহংকে তাড়াবার পর তখনও সে-ব্যাপারে আলোচনা করছিল গ্রামের লোকেরা, এমন সময় জ্ঞানপ্রকাশ গিয়ে খাবার দিতে বলে।

কিষাণ রেগে গিয়ে বলে, "খাবার দাবার কিছু হবেনা। যাও, না হলে লাঠি খেতে হবে।"

জ্ঞানপ্রকাশ হাতজোড় করে বলল, "আমি খেতে চাই ঠিক কিন্তু তাই বলে লাঠি খেতে চাই না।"

তার কথা শুনে সবাই হাসলো। জ্ঞানপ্রকাশ আবার বলল, "আমি শুনেছি,

এই গ্রামের লোক খুব বনেদী, যাক সে কথা, আপনারা হাঁড়ি আর জল দিলে আমি আপনাদের জন্য চমৎকার এক খাবার রান্না করে খাওয়াতে পারব।"

গ্রামের লোকের মনে কৌতুহল জাগল। জ্ঞানপ্রকাশ কিষাণের কাছ থেকে হাঁড়ি আর জল পেল। একটা গাছের নিচে তিনটি ইট বসিয়ে উনুন বানালো। এদিক ওদিক থেকে কটা কাঠ কুড়িয়ে উনুন ধরালো। উনুনের উপর জলভর্তি হাঁড়ি বসিয়ে পকেট থেকে একটি পাথরের টুকরো বের করে সেই হাঁড়িতে ফেলল। ওর এই কাণ্ডকারখানা সবাই দেখলো। কিছুক্ষণ পর ঐ হাঁড়ির গরম জল কয়েক ফোঁটা মুখে দিয়ে সুস্বাদু কোন কিছু খাবার মত ভঙ্গি করল। বলল, "চমৎকার হয়েছে, এতে দু একটা আলু পড়লে আরও স্বাদ হোত।"

এরপর ওখানে যারা জমেছিল তাদের মধ্যে থেকে একজন দু তিনটি আলু আনল। ঐ আলু হাঁড়িতে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে সেই জল চেখে জ্ঞানপ্রকাশ বলল, "বা! চমৎকার হয়েছে! এতে যদি দু মুঠো চাল পড়তো তাহলে আরও জমতো!" এক এক করে চাল, তরি-তরকারি সবই কেউ না কেউ এনে দিল।

গ্রামের ছেলে বুড়ে সবাই জ্ঞানপ্রকাশকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সব শেষে আবার ঐ রান্না করা জিনিষ মুখে দিয়ে জ্ঞান-প্রকাশ বলল, "এ-হে-হে, মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। নুন পড়ল না!" তৎক্ষণাৎ একজন ছুটে গিয়ে নুন আনল। তারপর গাছের পাতা পেড়ে জ্ঞানপ্রকাশ ঐ পাত্র নিয়ে বীরসিংহ যেখানে বসে ছিল সেখানে গেল। তার সাথে সাথে কিছু বাচ্চারাও গেল।

দুই বন্ধুতে পাতায় ঐ খাবার বেড়ে পেট পুরে খেল। বাকি যা ছিল তা ঐ বাচ্চাদের খেতে দিয়ে ঐ হাঁড়িটা মেজে ঐ কিষাণকে দিয়ে দিতে বলল।

তারপর ওরা দুজনে নিজেদের পথে পা বাড়াল।
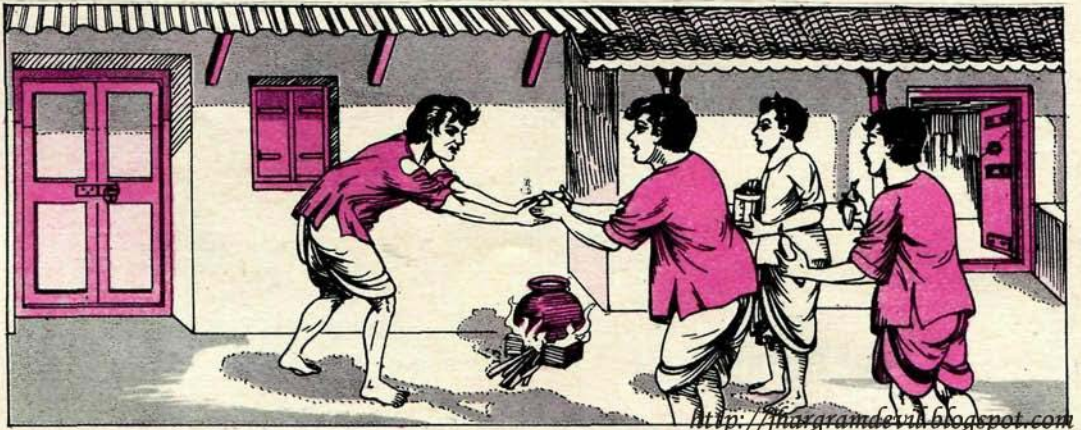
তানসেনের গুরু

তানসেনের গানে মুগ্ধ আকবর বাদশাহ তানসেনের গুরুর গান শোনার জন্যও ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সেইজন্য তানসেন তাঁকে অরণ্যে তাঁর গুরুর সাধনার গুহায় নিয়ে গেলেন।

তানসেনের গুরু সাধনায় মগ্ন। গুহার বাইরে অনেক্ষণ দাঁড়ানো সত্ত্বেও গুরু বাইরে বেরুচ্ছেন না। তানসেন তখন বেসুরে গান ধরলেন।

তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে, "ওরে, আমার শিষ্য হয়ে তুই একি গাইছিস ?" বলে গান গাইতে শুরু করলেন। তাঁর গান শোনার জন্য অরণ্যের জন্তু জানোয়ার গুলো জড়ো হয়ে গেল। আকবর পরমানন্দে তৃপ্ত হলেন।

ফিরে এসে আকবর বাদশা তানসেনকে বললেন, "আপনার গুরুর গান শুনতে জন্তুগুলোও হাজির হয়ে গেল, আপনি গাইলে আসেনা কেন ?"

সে কথার পিঠে বীরবল বলল, "তার কারণ, তানসেনের গুরু ঈশ্বরের দুনিয়ার গায়ক আর তানসেন হলেন আপনার দুনিয়ার গায়ক।" —গোপা দাসগুপ্ত

বাহাদুরীর ফল

এক দেশে মাণিক্যবর্মা নামে এক গেরস্থ ছিল। কোন কাজ সে করত না। পূর্ব-পুরুষেরা অনেক বিষয় সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল। ও সেই অর্থ ভাঙ্গিয়ে খেত। আর চারদিকে বড় বড় বুলি আউড়ে বেড়াত। কোন কোন জিনিস দশ টাকায় কিনে লোককে হয় কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে বলত। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি যা ছিল তা সে এই ধরনের গালগল্প প্রচার করতেই খাটাত।

একদিন মাণিক্যবর্মা সময় কাটাতে পালাগান শুনতে গেল। ওখানে অন্য একটা লোকের সাথে তার পরিচয় হোল। পালাগান শেষ হবার পর দুজনে এ কথা সে কথা বলতে বলতে পথ চলতে লাগল। নানান কথার পর মাঝপথে লোকটা মাণিক্যবর্মাকে বলল, "আজকে রাজার ঘরে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। রাজা রাজ-সভায় বসে আছেন। বিভিন্ন লোকের সাথে কথা হচ্ছে, এমন সময় খবর এলো রাণীর ভীষণ পেটের যন্ত্রণা হচ্ছে। রাজার কাছে যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে একজন বৈদ্যও ছিল। ঐ খবর পেয়ে রাজা ঐ বৈদ্যকে ভেতরে গিয়ে রাণীকে ওষুধ দিতে বলল।

বৈদ্য ভেতরে গিয়ে এতটা শুঁঠ চেয়ে ভেঙ্গে বেটে সেদ্ধ করে গুড় মিশিয়ে রাণীকে খাইয়ে দিল। খাওয়ার সাথে সাথে জাদুর মত পেট ব্যথা কমে গেল। তখন রাণী কী করল জানেন? কাছাকাছি কেউ আছে কিনা দেখে নিজের গলার রত্নহার বের করে ঐ বৈদ্যকে উপহার দিল। রাণী তাকে উপদেশ দিল : খুব সাবধানে রাখবে। কাউকে বলবে না। দেখলেন, ঐ টুকু ওষুধ খাইয়ে উপহার পেল কিনা রত্নহার। সেই জন্যই বলি, সেবা করতে

বিনয় দাস

হয় তো বড় লোকদেরই করা উচিত। গরীব-টরিবদের সেবা করলে কি আর হয়! ঐ বৈদ্য আমার বন্ধু হওয়ায় এই সব গোপন কথা আমি জানতে পারলাম। কাউকে বলবেন না!

কথা বলতে বলতে পেঁছাল এক কূয়োর কাছে। এই কূয়োটা অন্যধরনের। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামা যায়। যে লোকটা রাণীর পেট ব্যথার গল্প বলছিল সে ঐ কূয়োতে নামল। মাণিক্যবর্মা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আবার ওরা মিলিত হয়ে পরক্ষণে দুপথে দুজনে হাঁটা দিল।
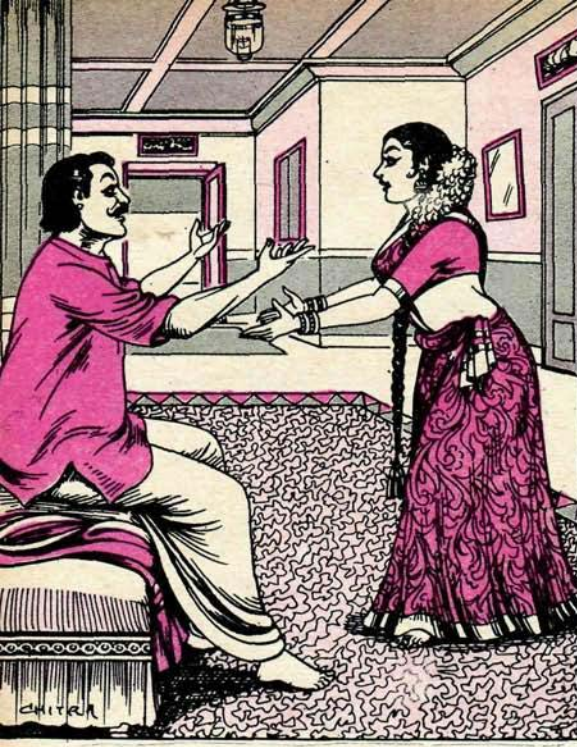
মাণিক্যবর্মার বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল।

"এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?" মাণিক্যবর্মার স্ত্রী প্রশ্ন করল।

মাণিক্যবর্মা চিরকাল সব ব্যাপারেই বাহাদুরী দেখাতে চায়। তাই সে বলল, "আজ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, জান? আমি এমনি একটু রাজাকে দেখে আসতে গিয়েছিলাম। ঠিক তক্ষুণি রাণীর ভীষণ পেটের ব্যথা শুরু হয়ে গেল। আমি সারিয়ে দেব বললাম। গেলাম অন্তঃপুরে। এই অন্তঃপুরের বাহার কী আর বর্ণনা করা যায়! হাসের পালকের উপর যেন রাণী শুয়ে ছটফট করছে। আমি তাড়াতাড়ি এতখানি শুঁঠ বাটিয়ে গুড় ঢেলে ফুটিয়ে রাণীকে খাইয়ে দিলাম। ঐ জিনিস পেটে যেতে না যেতেই রাণী সেরে উঠল। আমার ওষুধ মন্ত্রের মত কাজ করল। রাণী ভীষণ খুশী হোল। নিজের গলা থেকে তৎক্ষণাৎ রত্নহার বের করে দিল আমার হাতে। এইসব ঘটনার জন্যই এত রাত হোল ফিরতে।

"কোই দেখি সেই রত্নহার।" ওর স্ত্রী বলল।

"ওটা কেমন দেখতে জান? জ্বল জ্বল করছে! অমন অপূর্ব রত্নহার এত রাত্রে আমাদের ঘরে রাখা নিরাপদ নয় ভেবেছি। তাই ফেরার পথে সিঁড়িওয়ালা কূয়োতে

নেমে গোপনে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে এসেছি। ভোর রাত্রে গিয়ে নিয়ে আসব-খন।" বলল মাণিক্যবর্মা।

সেই রাত্রে মাণিক্যবর্মার স্ত্রী চোখের পাতা জুড়তে পারেনি। ঐ রত্নহার যতক্ষণ না নিজের চোখে দেখছে ততক্ষণ তার চোখে ঘুম নেই, পেটে খিদে নেই। পূর্ব দিকটা একটু ফর্সা হতেই কলস কাঁখে বেরিয়ে পড়ল মাণিক্যবর্মার স্ত্রী সেই সিঁড়িওয়ালা কূয়োর কাছে। এদিক ওদিক দেখে নেমে গেল কূয়োতে।

ভেতরে নেমে যেখানে হাত দিল সেখানেই রত্নহার ছিল। রত্নহার হাতে নিয়ে মহানন্দে চিৎকার করে উঠতেই তার পা হড়কে গেল। তখন ডুবে যাও-য়ার ভয়ে আর্তনাদ করতে লাগল।

মাণিক্যবর্মার বউ এর আর্তনাদ শুনে চারপাশের লোক জেগে উঠে কূয়োর কাছে এলো। তাকে কূয়ো থেকে তুলল। ওর হাতের রত্নহার সকলের নজরে পড়ল। মুহূর্তে রাজার প্রহরীদের কানে গেল এই খবর। আগের দিন রাণীর রত্নহার হারিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে রাজার প্রহরীরা নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ে ঐ রত্নহার খুঁজছে।

আগের দিন রাণীর পেট ব্যথা করার ঘটনা সত্য। রাণীকে যে-লোকটা ওষুধ দিয়েছিল, সে আর কেউ নয়, পালাগান শুনে ফেরা পথে মাণিক্যবর্মাকে ঐ সব কথা যে জানিয়েছিল সেই। সেই লোকটাই রত্নহারও চুরি করেছিল। সেই ফেরা পথে ঐ সিঁড়িওয়ালা কূয়োতে লুকিয়ে রেখেছিল। ওর কাছে গল্প শুনে ওর কাণ্ড কারখানা দেখে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মাণিক্য-বর্মা বউএর কাছে গল্প করেছিল।

মাণিক্যবর্মা যতই বোঝানোর চেষ্টা করুক না কেন রাজার বিশ্বাস হোলনা। রাজা ওকেই চোর হিসেবে ধরল। মাণিক্যবর্মাকে চাবুক মারার হুকুম দিল। সেই চাবুক খেয়ে বাড়িয়ে বলার বা রাজা উজীর মেরে বেড়ানোর অভ্যেস মাণিক্যবর্মার চিরকালের জন্য ছুটে গেল।

চোর আর সাধু

এক ঘোড়ার ব্যবসায়ীর ঘোড়া চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল একটি লোক।

"কেন করলে এ ধরণের খারাপ কাজ ?" জিজ্ঞেস করল ঘোড়ার ব্যবসায়ী।

"বাবু, চারদিন ধরে খেতে পাচ্ছিনা। তাই এই পাপ কাজ করে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। ছেড়ে দিন। আমি আর কোনদিন এদিকে পা বাড়াব না।" চোর করুণ কণ্ঠে বলল।

ব্যবসাদার কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "তোমাকে ভাবছি চাকরি একটা দেব। কিন্তু তোমাকে দেখেতো মনে হচ্ছে তুমি সে চাকরি করতে পারবেনা।"

"কী চাকরি বাবু, কী চাকরি বলুন না বাবু ?" চোর ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল।

"শুনে আর কি করবে বাপু ? তুমি নিজের জন্য ঘোড়া চুরি করতে গিয়েই এত সহজেই ধরা পড়লে, তুমি কি আর আমার জন্য ঘোড়া চুরি করতে পারবে ?" বলল ঘোড়ার ব্যবসাদার।

—সুনীতি মুখোপাধ্যায়
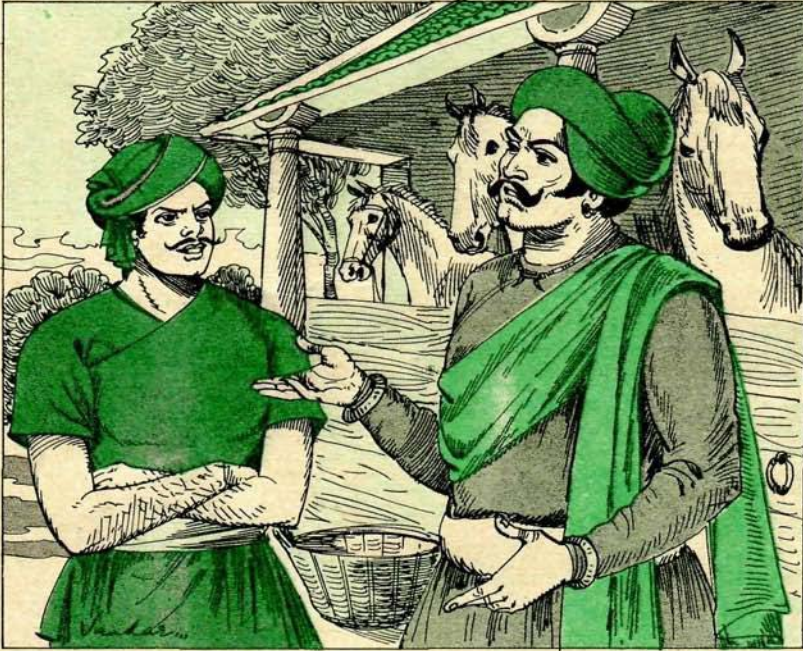
হৃদয়ফলক

সুন্দরপুরের যুবরাজ সুশীলকুমার পোশাক বদলে দেশান্তরে গেল। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছমাস ধরে ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু শিখল। তারপর ফেরার পথেও অনেক নতুন দেশ দেখতে দেখতে শেষে রাজপাট নামক দেশে পৌঁছাল। সুন্দর দেশ রাজপাট। সেখানকার মহল, বন আর উদ্যান দেখে যুবরাজ মুগ্ধ হোল।

সেই নগরে ঘুরতে ঘুরতে সুশীলকুমার হঠাৎ দেখতে পেল এক বিরাট প্রাচীর। দ্বারপালকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে সেটা রাজকুমারী শালিনীর নিজস্ব উদ্যান। সেই উদ্যানে কোন পুরুষের ঢোকা নিষেধ।

কিন্তু সুশীলকুমারের ভীষণ ইচ্ছা করল সেই উদ্যানে ঢোকার। সে উঁচু দেয়ালের চারদিক একবার ঘুরে দেখে পেছন দিক থেকে লাফ দিয়ে সেই উদ্যানে ঢুকল। সেই উদ্যান সত্যি ইন্দ্রের নন্দনকাননের চেয়ে সুন্দর ছিল। সুশীলকুমার কিছুক্ষণ ধরে উদ্যানের বিভিন্ন গাছ এবং ফুল আর ফল দেখে অবাক হয়ে গেল। শেষে একটি গাছের নিচে বসে বাঁশি বাজাতে লাগল। কাছের একটি সাপের ঢিপির গর্ত থেকে এক জাত-সাপ বেরিয়ে ফণা তুলে সুশীলকুমারের সামনে দুলতে থাকে। অত বড় সাপ দেখেই সুশীলকুমার বাঁশি বাজানো বন্ধ করে দেয়। পরক্ষণেই ঐ সাপ তাকে ছোবল মেরে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখ নীল হয়ে গেল। সুশীলকুমার অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল সেখানে।

সুশীলকুমারের বাঁশির আওয়াজ ঐ উদ্যানের ক্রীড়াভবন থেকে রাজকুমারী শালিনী শুনতে পায়। কোথায় কে বাঁশি

এ. সি. সরকার (ঐন্দ্রজালিক)
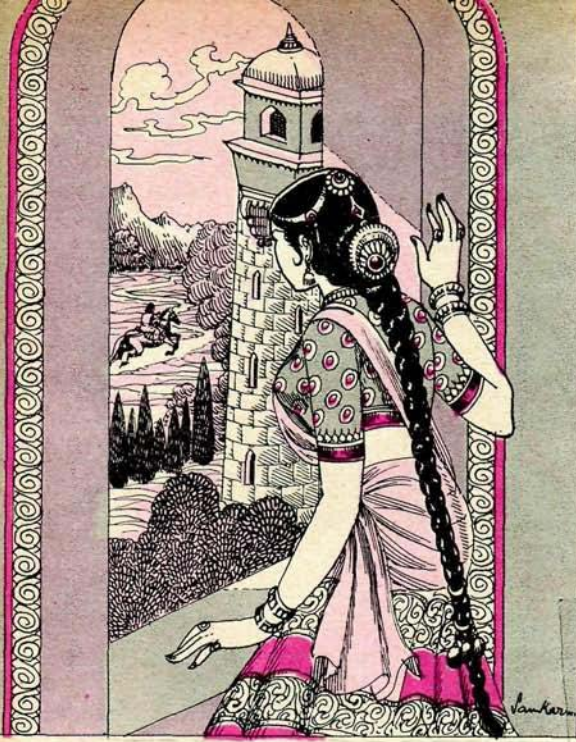
বাজাচ্ছে দেখার জন্য সে পথে কয়েকজন সখীদের নিয়ে ঐ ভবন থেকে বেরুল।

রাজকুমারী কাছে গিয়ে দেখে এক যুবক অজ্ঞান হয়ে হাতে বাঁশি নিয়ে পড়ে আছে। শালিনী তার চিকিৎসা করাল। তাকে ক্রীড়া ভবনে নিয়ে গেল। সেখানে চারদিন তাকে গোপনে রেখে তাকে ভালভাবে সারিয়ে তুলল।

রাজকুমারী নিজস্ব উদ্যানে ঢোকাই সুশীলকুমারের এক মস্ত বড় অপরাধ। রাজা অথবা তার পরিষদ কেউ জানতে পারলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। সেই জন্যই রাজকুমারী তাকে নিজের ক্রীড়াভবনে গোপনে রেখে সখীদের সাহায্যে চিকিৎসা করাল। তারপর রাজকুমারী জানতে পারল সেই যুবকের পরিচয়। সে এক দেশের যুবরাজ। কথাবার্তায় আচার আচরণে তার ব্যবহার দেখে রাজকুমারী মুগ্ধ হয়। তাদের দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশেষে ওরা শপথ করল পরস্পরকে বিয়ে করবে।

তারপর সুশীলকুমার গোপন পথে উদ্যানের বাইরে গিয়ে নিজের আস্তানায় গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরে এলো।

যুবরাজের ফেরার পর রাজা খুব খুশী হলেন। মন্ত্রীকে ডেকে যুবরাজের যোগ্য কনে খোঁজ করার নির্দেশ দিলেন। সুশীলকুমার কিন্তু বাবাকে জানায় নি যে সে ইতিমধ্যেই এক রাজকুমারীকে বিয়ে করার কথা দিয়েছে। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বিয়ের কথা বলতে তার ভীষণ সঙ্কোচ হচ্ছিল। আর একটি কারণ হল তার বাবা যদি একবার ঐ রাজকুমারী শালিনীর সাথে বিয়ে হবে না বলে আর কোন ক্রমেই তাঁকে রাজী করানো যাবে না!

তারপর যখন সে জানতে পারল যে বাবা তার জন্য কনে খুঁজতে মন্ত্রীকে বলেছেন তখন সে খাওয়া দাওয়া বাদ দিয়ে একটা ঘরে চুপচাপ বসে থাকত।

তার শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। মন্ত্রীপুত্র দেবদত্ত সুশীলকুমারের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল। সবার আগে সেই বুঝতে পেরে-ছিল সুশীলকুমারের মনের অবস্থা।

নানান কথার পরে দেবদত্ত জানতে পারল সুশীলকুমারের ঐ উদ্যানে যাও-য়ার কথা। রাজকুমারীকে বিয়ে করার শপথের কথা। রাজকুমারের অসহায় অবস্থার কথা।

"যুবরাজ, কিচ্ছু ভেবোনা। তেমন যদি দরকার পড়ে তো আমাদের দরবারী জাদুকরের সাহায্যে এমন এক উপায় বের করব যাতে তোমার বিয়ে ঐ রাজ-কুমারীর সাথেই হয়।" এই কথা বলে দেবদত্ত রাজকুমার সুশীলকুমারকে আশ্বাস দেয়।

কয়েকদিনের মধ্যেই নানান দেশের রাজারা সুশীলকুমারের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে দূত পাঠাতে থাকে। ঐ রাজাদের মধ্যে শালিনীর বাবাও ছিলেন।

কিন্তু রাজা এবং মন্ত্রী দেখে শুনে যে তিন চার জন কনেকে ঠিক করলেন তাদের মধ্যে শালিনী নেই। এই কথা দেবদত্ত বাবার কাছে জেনে নেয়। তখন দেবদত্ত ভেবে ঠিক করল সুশীলকুমারের ইচ্ছা পূরণ করতে হলে এমনি কাজ হবেনা। জাদুর সাহায্যেই কাজ সারতে হবে।
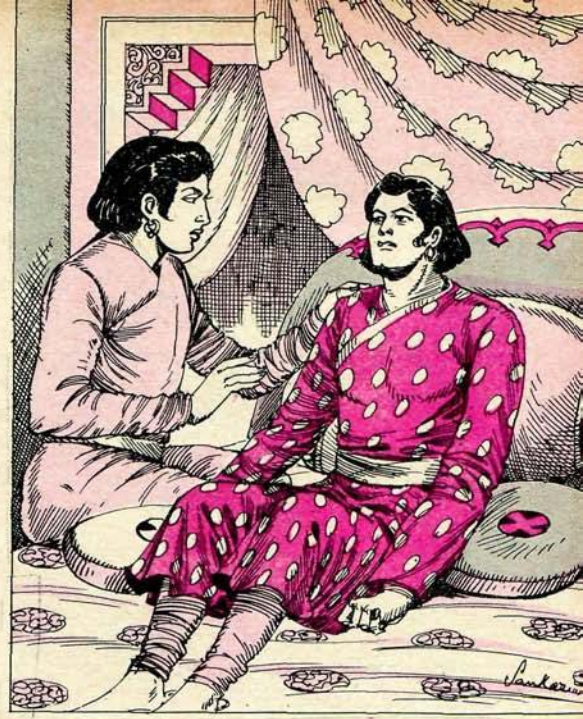
রাজা মন্ত্রীকে বললেন, "মন্ত্রীবর, আমরা যে রাজকুমারীদের বাছাই করেছি তাদের ঠিকুজী আনিয়ে জ্যোতিষীকে দেখানো দরকার।"

"মহারাজ, তার আগে যুবরাজের মতামত বোধহয় জেনে নেওয়া ভাল।" মন্ত্রী বুঝিয়ে বলল।

"আমার মতই আমার ছেলের মত। সে আমার মুখের উপর কথা বলবেনা। আপনি আপনার কাজে এগোতে পারেন।" বলল রাজা। রাজা বাচ্চা বয়স থেকেই ছেলেকে মনের মত করে গড়ে নিয়েছেন।

"কথাটা সত্য। কিন্তু এতো কোন রাজনীতির ব্যাপার নয়। বিয়ে ব্যাপারটা যতই হোক যুবরাজের নিজের সমস্যা। আপনি অনুমতি দিলে আমি তার মতামত জেনে নিতে পারি।" মন্ত্রী বলল।

"ঠিক আছে। তাই করুন।" রাজা বললেন।

দেবদত্ত অনেকক্ষণ ধরে সুশীলকুমারকে বুঝিয়ে রাজার কাছে নিয়ে এলো।

"আমার হৃদয়-ফলকে যে তরুণীর নাম আঁকা আছে তার সাথেই আমার বিয়ে করান।" সুশীলকুমার বলল।

"কার নাম আঁকা আছে বল, তুমি যার নাম বলবে আমি তার সাথে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি।" মন্ত্রী বলল।

"আমি জানলে তো বলব। আমি জানিনা তার নাম! আপনারাই চেষ্টা করে জানার চেষ্টা করতে পারেন।" সুশীলকুমার বলল।

"তা কি করে সম্ভব যুবরাজ?" মন্ত্রী নিরাশ হয়ে প্রশ্ন করল।

কথার পিঠে দেবদত্ত বলল, "হৃদয়ের কথা ইচ্ছে করলে জানা যায় বলে আমাকে জাদুকর মায়াধর জানিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করব?"

এই কথায় মন্ত্রী দরবারী জাদুকর মায়াধরকে ডেকে পাঠাল। তাকে সব কথা জানিয়ে বলল, "আমাদের যুবরাজের হৃদয়-ফলকে কোন্ কনের নাম খোদাই করা আছে তা যুবরাজ যদি নিজে না জানে, অন্যের পক্ষে জানা কি সম্ভব?"

মায়াধর স্বাভাবিক ভাবে হেসে বলল, "যোগবলে জানা যায়। যুবরাজকে আমার কাছে একটি রাত রাখতে হবে। তারপর আমি তার হৃদয়-ফলকের লিখন সভার সমক্ষে দেখাতে পারব। কিন্তু যে কনের নাম বুকে ফুটে উঠবে সেই কনের সাথেই বিয়ে দেওয়া উচিত। তা না হলে যুবরাজের পাগল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই

বেশী। আপনি এবং রাজা যদি রাজী থাকেন তো আমি কাজ শুরু করব। আশা করি, আজ্ঞা দিবেন।"

মায়াধরের কথা শুনে রাজার মনে যুগপৎ সন্দেহ এবং বিস্ময় জাগে। কিন্তু রাজা ভাবলেন, যোগের ফলে কি হবে কে জানে, আগে দেখা যাক কি ভাবে কি করে এই জাদুকর। এইসব ভেবে রাজা মত দিলেন।

একটি রাত সুশীলকুমার জাদুকরের ঘরে কাটাল। পরের দিন তাকে দরবারে আনা হোল। মন্ত্রী সমস্ত রাজকুমারীদের নাম জোরে জোরে পড়ে ঐ নাম লেখা কাগজ জাদুকরের হাতে দিল। জাদু দেখার জন্য সবাই হাঁ করে বসে আসে।

জাদুকর ঐ কাগজ একটি থালায় রেখে সেই কাগজ পোড়াল। সেই ছাই নিজের হাতে রগড়াল। তারপর যুব-রাজের নগ্ন বুকে সেই ছাই মাখা হাত ঘষল। শীঘ্রই যুবরাজের বুকে 'শালিনী' নাম ফুটে উঠল। সভার সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ়! পরক্ষণেই সভার সবাই সরব হোল।

"বাকী কাজ আপনারা করুন" বলে জাদুকর নিজের আসনে বসল।

রাজা শালিনীর সাথে যুবরাজের বিয়ে দিয়ে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। বিয়ের রাতে যুবরাজ শালিনীকে একটি সাবান উপহার দিল।

"এ আবার কেমনতর উপহার। এর চেয়ে দামী জিনিস আপনি পাননি?" শালিনী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"এই সাবানের সাহায্যেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে পেরেছি। জাদুকর মায়াধর এই সাবান দিয়েই তোমার নাম আমার বুকে লিখে তার উপর কায়দা করে ছাই ঘষে তোমার নাম ফুটিয়ে সভার সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিল। এই ভাবে কৌশল করে তোমাকে বিয়ে না করলে বাবা হয়তো তোমার সাথে আমার বিয়ে দিতেন না।" সুশীলকুমার বলল!

বাজী

কাঞ্চনপুরের রাজা খুব ধর্মাত্মা! রাজার মতো প্রজারাও খুব ধর্মপ্রাণ। রাজার সন্তান ছিলনা। তাই রাজার সাথে সাথে প্রজাদেরও দুঃখের সীমা ছিলনা।

অনেক ধর্মাত্মাদের মধ্যে এক দুরাত্মা লাভবান হয়ে থাকে। ঐ দুরাত্মা ব্যবসাদার। থাকত রাজধানীতেই।

সেই ব্যবসাদার তার এক গরীব প্রতিবেশীকে বলল, "আমি এক তান্ত্রিককে চিনি। সেই তান্ত্রিক তোমার মনের কথা বলে দিতে পারে। দশটি মুদ্রা দিলে আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব।" বলল।

"এর জন্য তান্ত্রিকের কি দরকার? তুমি মনে মনে কী ভাবছ তাতো আমিই বলে দিতে পারি!" বলল গরীব লোকটা।

"বাজী রাখবে?" বলল ব্যবসাদার।

"তোমার মনের কথা আমি বলতে না পারলে আমার যা আছে সব তোমাকে দেব। আর বলতে পারলে তোমার যা আছে তা আমাকে দেবে তো?" বলল গরীব লোকটা।

ব্যবসাদার এ বাজীতে রাজী হয়ে গেল। "কিন্তু একজন নিরপেক্ষ লোক দরকার। চল রাজার কাছে যাই।" বলল গরীব লোকটা।

দুজনেই রাজার কাছে গিয়ে নিজেদের বাজীর কথা বলল। রাজা বিচার করতে বসলেন।

"রাজার যাতে সন্তান হয় সেই কথাই তুমি ভাবছ। ঠিক কিনা, বল?" বলল গরীব লোকটা।

"ঠিক বলেছ।" বলে অগত্যা স্বীকার করে ব্যবসাদার নিজের সমস্ত সম্পত্তি গরীব লোকটাকে দিয়ে দিল।
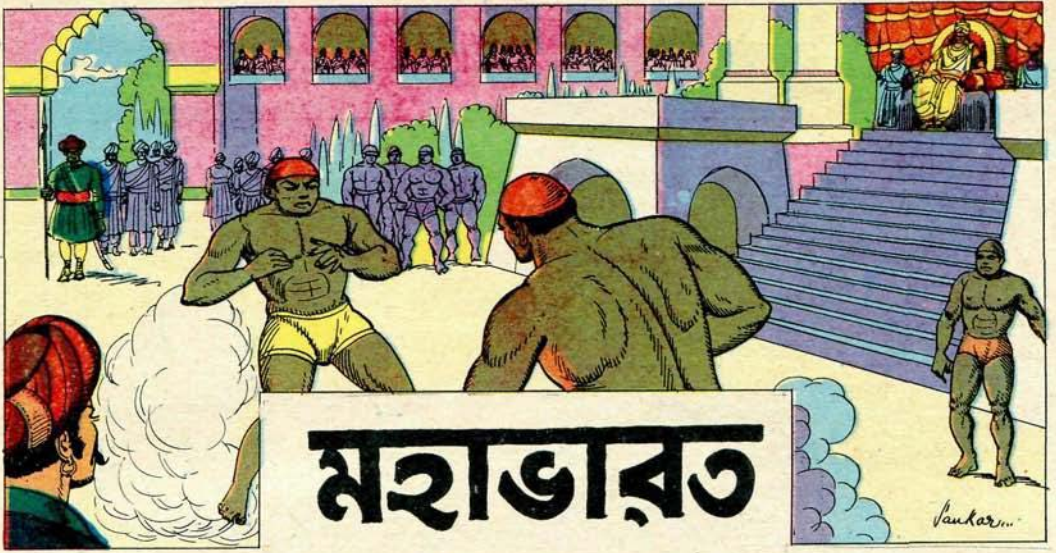
প্রায় তিন হাজার বছর আগে হস্তিনা নামে এক রাজ্যে বিচিত্রবীর্য নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল হস্তিনাপুর।

বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন। তাই বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসন পেলেন না।

ধৃতরাষ্ট্রের একশ ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলের নাম দুর্যোধন। দুর্যোধন দুঃশাসন প্রমুখেরা কুরুবংশীয় বা কৌরব নামে পরিচিত ছিলেন।

পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব। পাণ্ডুর ছেলে বলে তাদের বলা হত পাণ্ডব।

ধৃতরাষ্ট্রের জীবদ্দশাতেই পাণ্ডু মারা যান। তখন পাণ্ডুর ছেলেদের লেখাপড়া ও দেখাশোনার ভার নিলেন ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই দুর্যোধন দুঃশাসনসহ সবাই একসঙ্গেই মানুষ হতে লাগলেন। গুরু দ্রোণাচার্য তাঁদের সকলকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা কিন্তু পাণ্ডবদের সহ্য করতে পারতেন না। প্রায়ই নানা ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে পাণ্ডবদের ঝগড়াঝাঁটি খিটিমিটি লাগত।

একেই কৌরবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের সদ্ভাব ছিলনা, তার উপর ভীম ও অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হওয়াতে কৌরবরা

পাণ্ডবদের আরও বেশি হিংসা করতে লাগলেন । তারপর ধৃতরাষ্ট্র যখন ভাইদের মধ্যে সকলের বড় যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করলেন আর সারা রাজ্যের লোক যখন যুধিষ্ঠিরের গুণগান করতে শুরু করল তখন দুর্যোধন আর থাকতে পারলেন না ।

পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠানোর মূলে দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি ছিল । তাঁর অভি-সন্ধি ছিল জতুগৃহে পাণ্ডবদের পোড়ানো।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিদুর নামে এক ভাই ছিলেন । তিনি পাণ্ডবদের খুব ভালবাসতেন। তাঁর উপদেশ ও সাহায্যের ফলে শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবরা রক্ষা পেলেন । পাণ্ডবরা নিজেরাই জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে অন্য জায়গায় সরে পড়লেন। এক নিষাদী ও তাঁর পাঁচ পুত্র সে-আগুনে মারা গেল ।

এদিকে পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই ঘুরতে ঘুরতে পাঞ্চাল দেশে এসে হাজির হলেন। নির্দিষ্ট দিনে দেশ বিদেশ থেকে রাজা-রাজড়ারা দ্রৌপদীর বরমাল্য পাবার আশায় এলেন। খবর পেয়ে পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাইও ছদ্মবেশে এসে হাজির হলেন। যিনি ধনুকে তীর চড়িয়ে উপরে ঝুলান জিনিসটি বিঁধতে পারবেন, তিনিই দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভ করবেন ।

ছদ্মবেশী অর্জুন অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। ভীম ও অর্জুন ঘরে ফিরে মাকে বললেন, "মা আজ আমরা একটি সুন্দর জিনিস এনেছি।" কুন্তী দ্রৌপদীকে দেখতে পাননি, ঘরের ভিতর থেকেই বললেন, 'যা পেয়েছ তা তোমাদের সকলেরই হোক !' তারপর দ্রৌপদীকে দেখে তিনি অবাক, কিন্তু যা বলে ফেলেছেন, তা আর ফেরানো যায়না। তাই মাতৃভক্ত পাঁচ ভাই মায়ের কথা রক্ষা করার জন্য তাঁরা সকলে মিলে দ্রৌপদীকে বিয়ে করলেন।

পাণ্ডব-দ্রৌপদীর বিবাহের সুসংবাদ

দুর্যোধনের কানে গিয়ে পেঁীছল। রাগে ক্ষোভে দুঃখে তিনি জ্বলতে লাগলেন। তিনি আবার নতুন ফন্দি আঁটতে লাগলেন।

শেষে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম আর দ্রোণের পরামর্শে পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দিলেন। হস্তিনারাজ্যের দক্ষিণে খাণ্ডবপ্রস্থ হল পাণ্ডবদের নতুন রাজ্য। রাজধানীর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। অতঃপর পাণ্ডবরা রাজসূয় নামে এক যজ্ঞ করবেন মনস্থ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে মগধের পরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা শেষ করে যজ্ঞানুষ্ঠানের পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে ভীম ও অর্জুন মগধে গেলেন। সেখানে ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের প্রচণ্ড এক মল্লযুদ্ধ হল। যুদ্ধে জরাসন্ধকে হত্যা করে ভীম অর্জুন ও কৃষ্ণ সহ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন। রাজাদের কাছ থেকে কর ও নানাবিধ উপহার-উপঢৌকন আদায় করে রাজধানীতে ফিরে এলে রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হল। যজ্ঞের শেষে যুধিষ্ঠির সাধ্যমত প্রার্থীদের টাকাকড়ি জিনিসপত্র দিলেন। সকলেই এক মুখে পাণ্ডবদের গুণগান করতে লাগলেন, পাণ্ডবদের সমৃদ্ধির প্রশংসা করতে লাগলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ যেন ইন্দ্রের রাজধানী! দুর্যোধন আর থাকতে পারলেন না। শেষে মামা শকুনির সাথে পরামর্শ করে পাশা খেলার ব্যবস্থা করলেন। দুর্যোধনের হয়ে শকুনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে খেলতে বসলেন। কিন্তু হায়, শকুনি এমন নিপুণভাবে ফাঁকি দিতে লাগলেন যে যুধিষ্ঠির প্রতি বারেই হারেন। দেখতে দেখতে গোটা পাণ্ডব-রাজ্য দুর্যোধনদের হাতে চলে গেল। শেষকালে দ্রৌপদীকে পণ রাখতে হল। এবং এমনই দুর্ভাগ্য পাণ্ডবরা শেষে দ্রৌপদীকেও হারালেন।

দুর্যোধন-দুঃশাসন পাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে যার-পর নাই অপমান করলে, অনেকে প্রকাশ্যভাবে কৌরবদের নিন্দা করলেন। শেষে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে

দিলেন। কৌরবরা এতে অসন্তুষ্ট হলেন। স্থির হল, আবার পাশা খেলা হবে, আর এবার হেরে গেলে পাণ্ডবদের বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে।

আবার পাশা খেলা হল, এবং শকুনির কূটকৌশলে হেরে গিয়ে যুধিষ্ঠির ভাই ও দ্রৌপদীকে নিয়ে বনবাসে চলে গেলেন।

নানা ঘটনার মধ্যে পাণ্ডবদের বারো বৎসরের কাল উত্তীর্ণ হল। বাকি আছে মাত্র এক বৎসর। অজ্ঞাতবাসের বৎসর সেটি। সেজন্য পাণ্ডবদের ভয়ানক চিন্তা, কারণ দুর্যোধনের দল যদি কোন মতে তাঁদের সন্ধান পায় তা হলে আবার বারো বৎসরের জন্য বনবাস। পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে মৎস্য দেশের ধার্মিক রাজা বিরাটের আশ্রয় নিলেন।

যুধিষ্ঠির পাশা খেলে যা জিতে পান তাই ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। ভীম ভাল কিছু রাঁধলেই অন্য ভাইদের খেতে দেন। অর্জুন যে কাপড় পান ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। নকুল ঘোড়া দেখাশোনা করেন। বিরাট রাজা তাঁর কাজে খুশি হয়ে উপহার দেন। সেই উপহার নকুল ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। সহদেব দুধ দই যা পান তাই প্রত্যেক ভাই বন্টন করে নেন। দ্রৌপদী প্রত্যেক স্বামীর প্রতি এমন ব্যবহার করেন যাতে কেউ অন্য কিছু সন্দেহ করতে না পারে।
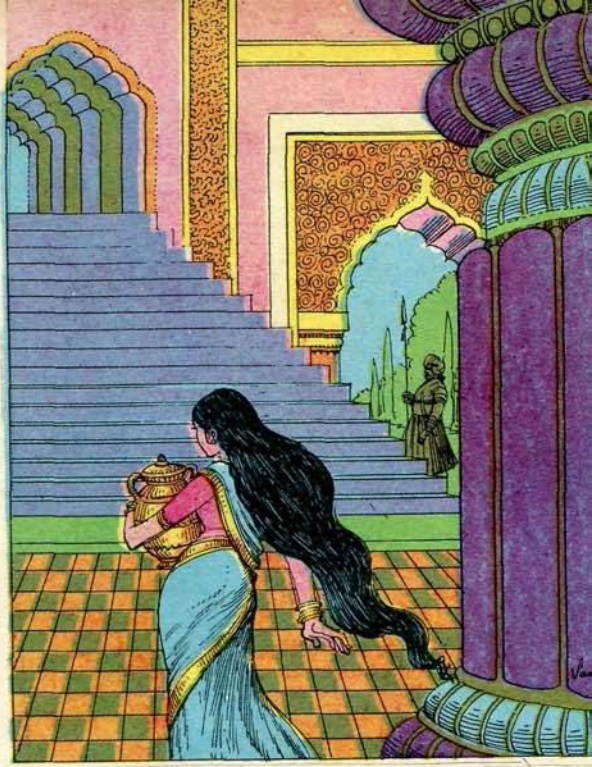
তারপর মৎস্যদেশে শুরু হোল ব্রহ্মোৎসব। মল্লযুদ্ধ এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। জীমূত ছিল খুব বলবান। সে সবাইকে মল্লযুদ্ধে আহবান করতে লাগল। রাজা বিরাট রন্ধনকারী ভীমকে ডেকে জীমূতের সাথে লড়তে বললেন। ভীম রাজী হয়ে গেলেন। ভীম জীমূতকে মাটি থেকে তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে অনেকক্ষণ পরে মাটিতে আছড়ে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ জীমূত মরে গেল। রাজা

বিরাট ভীমকে অনেক উপহার দিলেন। অতঃপর রাজা বিরাট নানান দেশের মল্লদের সাথেও ভীমকে লড়তে বললেন। নারীপুরুষ নির্বিশেষে সে দৃশ্য দেখতে লোক ভেঙ্গে পড়ত।

এইভাবে অর্জুন নকুল প্রত্যেকে যে যার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাতে লাগল এবং রাজা বিরাট তাদের পুরস্কৃত করছিলেন।

পাণ্ডবদের এক বছর পূরণ হতে আর দেরি নেই। কেটে যাচ্ছিল ভালই। কিন্তু বিপদের কি শেষ আছে! রাজা বিরাটের শ্যালক এবং প্রধান সেনাপতির নাম ছিল কীচক। তার চোখ পড়ল দ্রৌপদীর উপর। নিজের বোনকে নানান কথা বুঝিয়ে দ্রৌপদীর মন পাওয়ার উপায় ঠাওরাতে লাগল। দ্রৌপদীকে একদিন একা পেয়ে তাঁকে ভাল ভাল কথা বলতে লাগল। "তুমি আমাকে অবহেলা কোর-না। এই রাজা আর রাজ্যের সমস্ত ভার আমার উপর আছে। ধনসম্পদে, রূপে আর যৌবনে আমার চেয়ে যোগ্য লোক আর সারা দুনিয়ায় একজনও নেই। এ হেন লোকটিকে গ্রহণ করে সারাজীবন তুমি সুখভোগ কর। তোমার কোন কিছুর অভাব থাকবে না। কেন এদের সেবাদাসী হয়ে পড়ে আছ অবহেলায় অবজ্ঞায়। বল, আমাকে গ্রহণ করবে?" বলল কীচক।

দ্রৌপদী তার মৎলব বুঝতে পেরে বললেন, "আমার পাঁচজন পতি আমার উপর সব সময় নজর রেখেছেন। তুমি আমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করলে ওরা তোমাকে প্রানে মেরে ফেলবে।"

কীচক বোন সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে বলল, "বোন, যেকোন ভাবে সৈরিন্ধ্রীকে বোঝাও না। ওকে না পেলে আমি কোন-ক্রমেই বাঁচতে পারব না। ওকে আমার চাই। তুমি বোঝাও।"

কীচকের বোন রাণী সুদেষ্ণা কত করে বোঝাল, "দেখ দাদা, সৈরিন্ধ্রীকে আমার দায়িত্বে রেখেছি। তার পাঁচজন

স্বামী আছে। কেন তুমি ওকে পেতে চাইছ। এর ফল ভাল হবেনা। তুমি এপথ ছেড়ে দাও। শেষে ঐ পাঁচজন টের পেলে তোমার ক্ষতি হবে।"

কীচক বলল, "পাঁচজন কেন এক হাজার লোক এলেও আমার কিছুই করতে পারবেনা।"

দাদার কথা শুনে রাণী সুদেষ্ণা নিরুপায় হয়ে দ্রৌপদীকে পানীয় আনতে কীচকের ঘরে পাঠায়। ঘরে ঢুকতেই সানন্দে কীচক দ্রৌপদীর হাত ধরে ফেলে বলে, "সুন্দরী তোমাকে স্বাগত জানাই। আমার প্রাণেশ্বরী তুমি। তুমি নিজেই আমার ঘরে আসবে এ-আমি ভাবতেই পারিনি।" দ্রৌপদী তার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে যায় রাজা বিরাটের দরবারে। পেছনে পেছনে গিয়ে কীচক দ্রৌপদীর চুল ধরে টান দেয়।

দ্রৌপদীর উপর এই অত্যাচার যুধিষ্ঠির এবং ভীমের নজরে পড়ল। ভীম রাগে গজ গজ করতে লাগলেন। দ্রৌপদী অসহায় ভাবে একবার যুধিষ্ঠির আর একবার ভীমের দিকে তাকাতে থাকেন। ধর্মরাজ দ্রৌপদীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, "তোমার স্বামীরা সব কিছু দেখে শুনেও কিছু যদি না করে তো বুঝতে হবে তারও একটি কারণ আছে। স্থান-

কালপাত্র বুঝে সব কাজ করতে হয়।" তোমার অন্তঃপুরেই যাওয়া উচিত। যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য শুনে তার মর্ম বুঝে দ্রৌপদী অন্তঃপুরে রাণী সুদেষ্ণার কাছে চলে যান।

রাণী সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে বলে, "মালিনী, তোমাকে কে কষ্ট দিয়েছে? কি হয়েছে তোমার?"

"আপনার নির্দেশে কীচকের ঘরে ঢুকতেই কীচক আমাকে অপমানজনক কথা বলেন, ভরা সভায় আমার চুলধরে টানেন। এই ঘটনা দেখে যিনি ভীষণ ভাবে চটে গেছেন তিনিই হয়ত কীচককে বধ করবেন।" দ্রৌপদী বললেন।

দ্রৌপদী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন ভীমকে দিয়ে কীচককে বধ করাবেন। দ্রৌপদী রাত্রে ভীমের ঘরে ঢুকলেন। ভীম তখন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। দ্রৌপদী তাকে তুলে কীচক যে কি ভাবে তাকে অপমান করেছে তা বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে কীচককে অবিলম্বে বধ করতে বলেন।

ভীম বললেন, "ঐ পাজি কীচক ভরা সভায় তোমাকে লাথি মেরেছে। তা দেখে তখনই আমি তাকে বধ করতাম। যুধিষ্ঠির আমাকে আটকালো! বলল, আর কিছুদিন পরে দ্রৌপদী মহারাণী হবে। ধৈর্য ধর।"

দ্রৌপদী বললেন, "এত দুঃখ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার আর রাণী হওয়ার সখ নেই। এখন যা হোল তার বদলা নেবার কথা ভাবুন! বিরাট রাজাও কীচকের পক্ষ নিচ্ছেন। আমি নাকি খুব সুন্দরী তাই কীচকের ভাল লেগেছে আমাকে। এসব অসহ্য। কীচককে আমি বলেছি যে আমার স্বামীরা তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। সুদেষ্ণাও কীচককে সাহায্য করছে। ঐ আমাকে কীচকের ঘরে পানীয় আনতে পাঠিয়েছিল। আপনি ঐ কীচককে বধ না করলে আমি বিষ খেয়ে মৃত্যু বরণ করব।"

ভীম সব কথা শুনে বললেন, "তোমার কথামত আমি কীচককে বধ করব। তবে, তোমাকে একটু অভিনয় করতে হবে। নৃত্য মণ্ডপে রাত্রে কেউ থাকেনা। সেখানে একটা বিছানাও পড়ে থাকে। তুমি কীচককে রাত্রে সেই নৃত্যমণ্ডপে দেখা করতে বল। আমি এক কোনে লুকিয়ে থাকব। তারপর ঠিক সময়ে আমি তার মাথা ফাটিয়ে দেব।

এইভাবে ভীম এবং দ্রৌপদী কীচককে কিভাবে বধ করা হবে তা ঠিক করলেন।

(চলবে)

শিবপুরাণ

এক

ব্রহ্মা তারকাসুরের ছেলেদের তপস্যায় খুশী হয়ে দর্শন দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বল, তোমরা কি বর চাও ?"

"ঠাকুর, আমাদের এমন মৃত্যু দিন যাতে আসলে রথ নয় এমন রথে চড়ে, ধনুক আর তীর নয় এমন তীর ধনুক দিয়ে আমাদের মৃত্যু হয়। এছাড়া আমাদের সকল প্রকার বিদ্যার অধিকারী করে দিন। বিদ্যায়, তেজে, শক্তিতে, সুখভোগে, ত্যাগে এবং শিবভক্তিতে আমরা যেন অদ্বিতীয় হতে পারি। আমাদের বাসযোগ্য পরিবেশ যেন সোনা রূপা আর লোহায় পরিপূর্ণ থাকে।" তিন ভাই যেন এক নিশ্বাসে নিবেদন করল।

ব্রহ্মা তাদের এই বর দিয়ে, বিশ্বকর্মাকে ওদের যত ইচ্ছা তত সোনা রূপা লোহা দিয়ে বাসযোগ্য নগর নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান।

বিশ্বকর্মা সোনা রূপা লোহা দিয়ে তিনটি নগর বানিয়ে তারকাসুরের পুত্রদের দিয়ে দেন। সেইগুলোই ত্রিপুর নামে বিখ্যাত। সেই নগরগুলো যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারতো। আকাশের বুকে সেই নগর শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকত। সেই নগরে ঘর বাড়ি, গাছপালা, পুকুর, ধন এবং ধান পূর্ণ মাত্রায় ছিল। সোনায় নির্মিত নগরে তারকাক্ষ, রূপায় নির্মিত নগরে কমলাক্ষ এবং লোহায় তৈরি নগরে বিদ্যুন্মালী বাস করে তিন লোকে নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনা করত।

এই ত্রিপুর জয় করা স্বয়ং ইন্দ্রের পক্ষেও সম্ভব ছিলনা। অন্যান্য দেবতারা তো পারেই নি। তারা সবাই ব্রহ্মার

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

কাছে গিয়ে বলল, "ত্রিপুরাসুরেরা আমাদের জ্বালিয়ে মারছে। ওরা ওদের নগর দিয়ে আমাদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে।" দেবতারা আর্ত-নাদ করে উঠল।

"ত্রিপুরাসুরেরাতো সহজে মরবেনা। এ ব্যাপারে আমরা বরং শিবের পরামর্শ নিয়ে আসি!" বলে ব্রহ্মা ওদের নিয়ে শিবের কাছে গেলেন। ওদের দেখেই শিব ওদের আসার কারণ বুঝতে পেরে বললেন, "আমি ত্রিপুরাসুরদের মেরে ফেলতে পারব না। প্রয়োজন হলে আমি আমার অর্দ্ধেক শক্তি দিতে পারি আপনাদের। সেটা কাজে লাগাতে পারেন।"

ত্রিপুরাসুরদের কি ধরনের বর দিয়েছেন তা জানিয়ে ব্রহ্মা বললেন, "এখন আমাদের সকলের শক্তি তুমিই গ্রহণ করে এ যাত্রা উদ্ধার কর।" ওদের ধ্বংস করতে তো রথ নয় এমন রথ, তীর নয় এমন তীর, ধনুক নয় এমন ধনুক চাই। তাই শিব পৃথিবীকে রথ, বেদ গুলো দিয়ে রথের ঘোড়া, আর সূর্যচন্দ্রকে করলেন রথের দুই চাকা। মেরু পর্বতকে বানালেন ধনুক, আদিশেষকে বানালেন সেই ধনুকের ছিলা। আর বিষ্ণুকে নারায়ণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ত্রিপুরের উপর আক্রমণ করলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ তিনটি নগর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে গেল।

ত্রিপুরাসুরদের পরে জলন্ধর নামক অন্য এক রাক্ষস জন্মে সমস্ত লোকে দাপট দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জলন্ধরের আসল নাম সূকর। সে ছিল হিরণ্যকশ্যপের দশম পুত্র অগ্নিজিহ্বের পুত্র। কঠিন তপস্যা করে সে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়েছিল। দেবতা, রাক্ষস, নাগ তথা মানুষের হাতে তার মৃত্যু ঘটতে পারেনা সেই বরের ফলে। ঐ বরের জোরে সে জলে বাস করতে পারত। তার এই অসীম শক্তিবলে সে

আটটি দিক জয় করে স্বর্গে পাড়ি দিয়ে ইন্দ্রকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে তিনলোকে হুকুম চালাত।

জলন্ধরের কাছে পরাজিত হয়ে কৈলাসে শিব এবং বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু পালিয়ে মানস সরোবরে লুকিয়ে রইল। সেখানে শিব এবং বিষ্ণু ব্রহ্মার তপস্যা করলে ব্রহ্মা হাজির হয়ে শিবকে ত্রিশূল এবং বিষ্ণুকে চক্র দিয়ে বললেন, "তোমরা নিজেদের অস্ত্র অদল বদল করে নিয়ে জলন্ধরকে মেরে ফেল।"

এর ফলে শিব এবং বিষ্ণু খুশী হয়ে বিষ্ণু ত্রিশূল এবং শিব চক্র নিয়ে জলন্ধরের অপেক্ষা করতে লাগল।

নারদের কানে যেতেই সে জলন্ধরের কাছে গিয়ে বলল, "কাকে খুঁজছ? শিব আর বিষ্ণুতো মানস সরোবরে লুকিয়ে আছে।"

তক্ষুণি জলন্ধর মানস সরোবরে গিয়ে তন্নতন্ন করে শিব এবং বিষ্ণুকে খুঁজতে লাগল। এ ব্যাপার জানতে পেরেই শিব এবং বিষ্ণু জল থেকে উঠে তীরে জলন্ধরের অপেক্ষা করতে লাগল। শিবের হাতে চক্র এবং বিষ্ণুর হাতে ত্রিশূল।

খুঁজে খুঁজে না পেয়ে জলন্ধর মানস সরোবর থেকে উঠে এলো তীরে। ওদের দেখেই জলন্ধর ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিব এবং বিষ্ণু জলন্ধরকে দু-টুকরো করে ফেলল। জলন্ধরের মৃত্যুর পর তিন লোকের মানুষ স্বস্তি পেল!
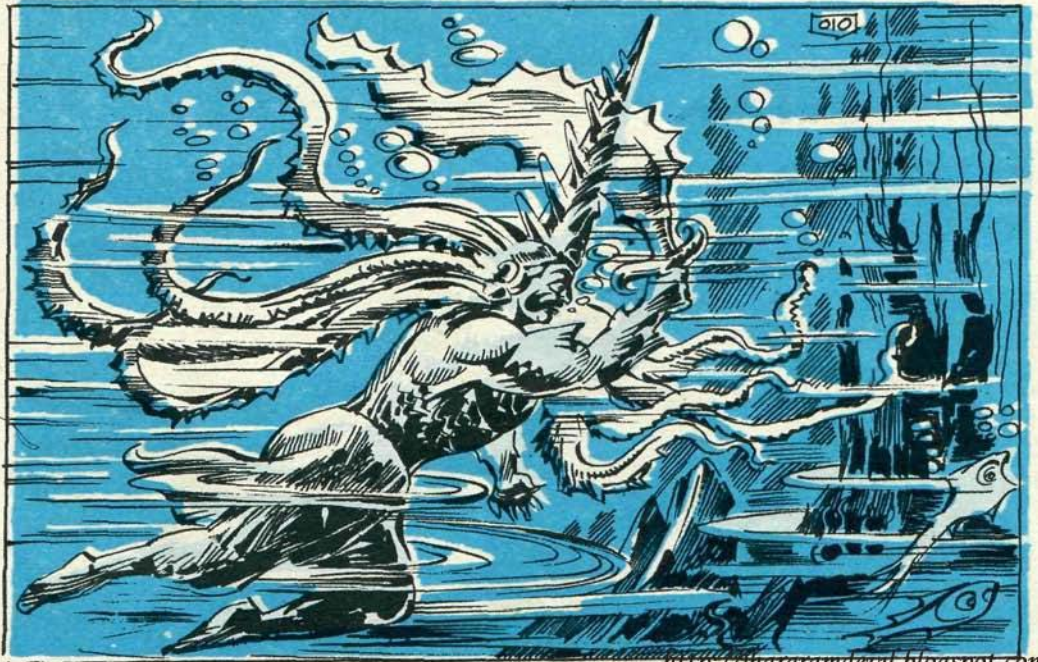
কশ্যপ প্রজাপতির পুত্রদের মধ্যে বিপ্রজিৎ নামে এক দানব ছিল। ঐ বিপ্রজিতের দম্ভ নামে এক ছেলে ছিল। দম্ভ ছিল বিষ্ণু ভক্ত। সব সময় বিষ্ণু পূজা করত। দম্ভের অনেক কাল পর্যন্ত কোন সন্তান ছিলনা। সেই জন্য সে বদ্রিকাশ্রমে গিয়ে বিষ্ণুর জন্য ঘোর তপস্যা করতে লাগল।

অবশেষে বিষ্ণু দর্শন দিয়ে বর চাইতে বললেন।

"হে ঠাকুর আপনি আমাকে এমন এক সন্তান দিন যে আপনার শক্তির সমান শক্তি সম্পন্ন হবে, তিন লোক জয় করতে পারবে, কারো হাতে তার মৃত্যু হবে না এবং আপনার প্রতি তার প্রবল ভক্তি থাকবে।" দম্ভ বিষ্ণুর কাছে এই বর চাইল।

বিষ্ণু দম্ভের চাওয়া বর দিলেন। দম্ভ বাড়ি ফিরে গিয়ে এই শুভ সংবাদ স্ত্রীকে বলল। তারপর দম্ভের স্ত্রী কিছুদিন পরে শুভ মুহূর্তে পুত্রের জন্ম দিল। সেই ছেলের নাম শঙ্খচূড় রেখে আদর যত্নে লালনপালন করতে লাগল তাকে।

শঙ্খচূড় কালক্রমে শুক্রাচার্যের কাছে সকল প্রকার বিদ্যা অর্জন করে বড় হয়ে বাবা মার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে গেল। ব্রহ্মার জন্য অন্নজল ত্যাগ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে সে তপস্যায় মগ্ন হোল। অবশেষে ব্রহ্মা দর্শন দিয়ে বললেন, "ভক্তবর, কি বর চাও বল?"

"আমি দেবতা, রাক্ষস, নাগ এবং মানুষকে জয় করার ক্ষমতা চাই। আর সমস্ত রকমের সুখ ভোগ করতে চাই। এই বরই আমার প্রার্থনা।" শঙ্খচূড় বলল।

ব্রহ্মা তার আকাঙ্ক্ষিত বর দিয়ে তাকে বললেন, "ভক্তবর, তুমি বদ্রিকাশ্রমে যাও। সেখানে তুলসী নামে এক কন্যা তপস্যা করছে; তুমি তাকে বিয়ে করে সুখে দিন যাপন কর।" এই কথা বলে ব্রহ্মা অদৃশ্য হলেন।

(চলবে)

শিকারী পশুপালন

সোভিয়েত দেশে মস্কো নগরের ঈশানকোণে 'কস্ত্রোম' নামক এক কৃষি গবেষণা ক্ষেত্র আছে। সেখানে বারখাঁজের সিংধারী শিকারী পশুপালন করা হয়। ঐ পশুদের দিয়ে কোন কাজ না করিয়ে তাদের জীবনের অভ্যাসগুলো অধ্যয়ন করা হচ্ছে। মাদী বার খাঁজের সিংধারীনীদের দুধ দোয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ওদের দুধে তিনগুণ বেশি চবি হয়। ওদের দুধ শুধু যে গাঢ় হয় তাই নয় সেই দুধের চমৎকার সুগন্ধও আছে। এই দুধকে মন্থন না করেই মাখন বের করা যায়।

এখানে পালিত বারখোঁজের সিংধারীরা জঙ্গলে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। ওদের জন্য বড় ঘরের প্রয়োজন হয়না। কুঁড়ে ঘর এবং সাধারণ খাটালই যথেষ্ট। এই জন্তুদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। মোটাসোটা বারখাঁজের সিংধারীর ওজন চারশো থেকে পাঁচশো কিলো পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই জন্তুগুলো জঙ্গলে গজিয়ে ওঠা ঘাস খেয়ে বাঁচতে পারে। এখানে বারখাঁজের সিংধারীদের তরকারী এবং চারা খাওয়ানো হয়ে থাকে। এই জন্তু থেকে পাওয়া যায় ভাল মাংস, দুধ, চর্বি ও সিং এবং চামড়া। এদের বাহন হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
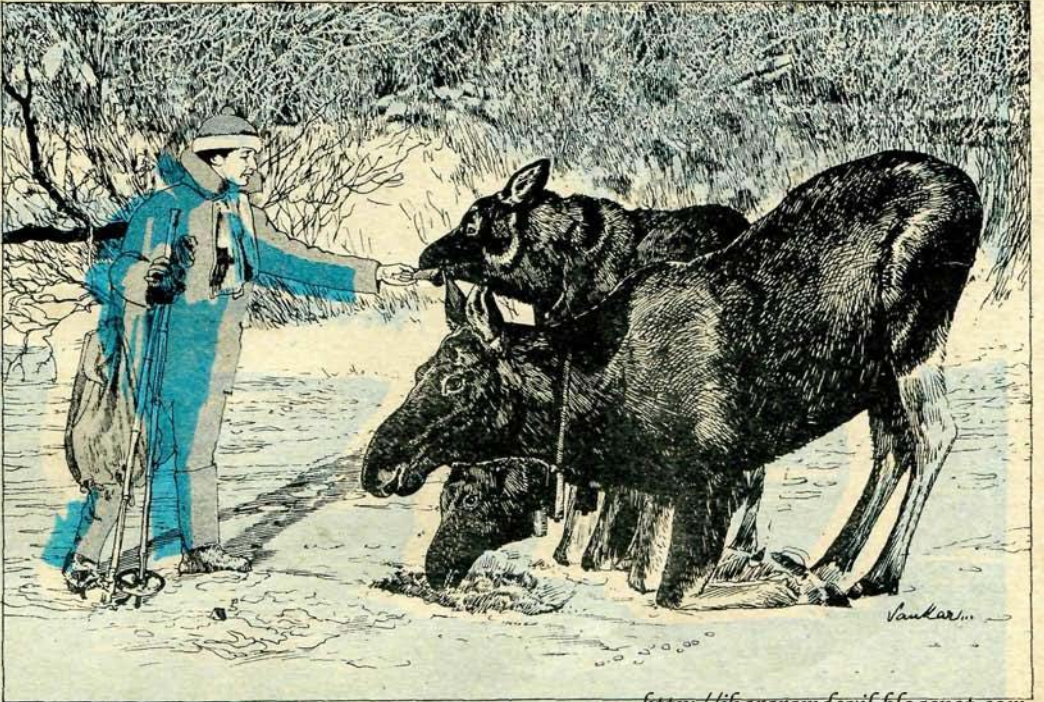
ফটো : প্রভাকর মহাদিক

খাবার চাই

ফটো : প্রভাকর মহাদিক
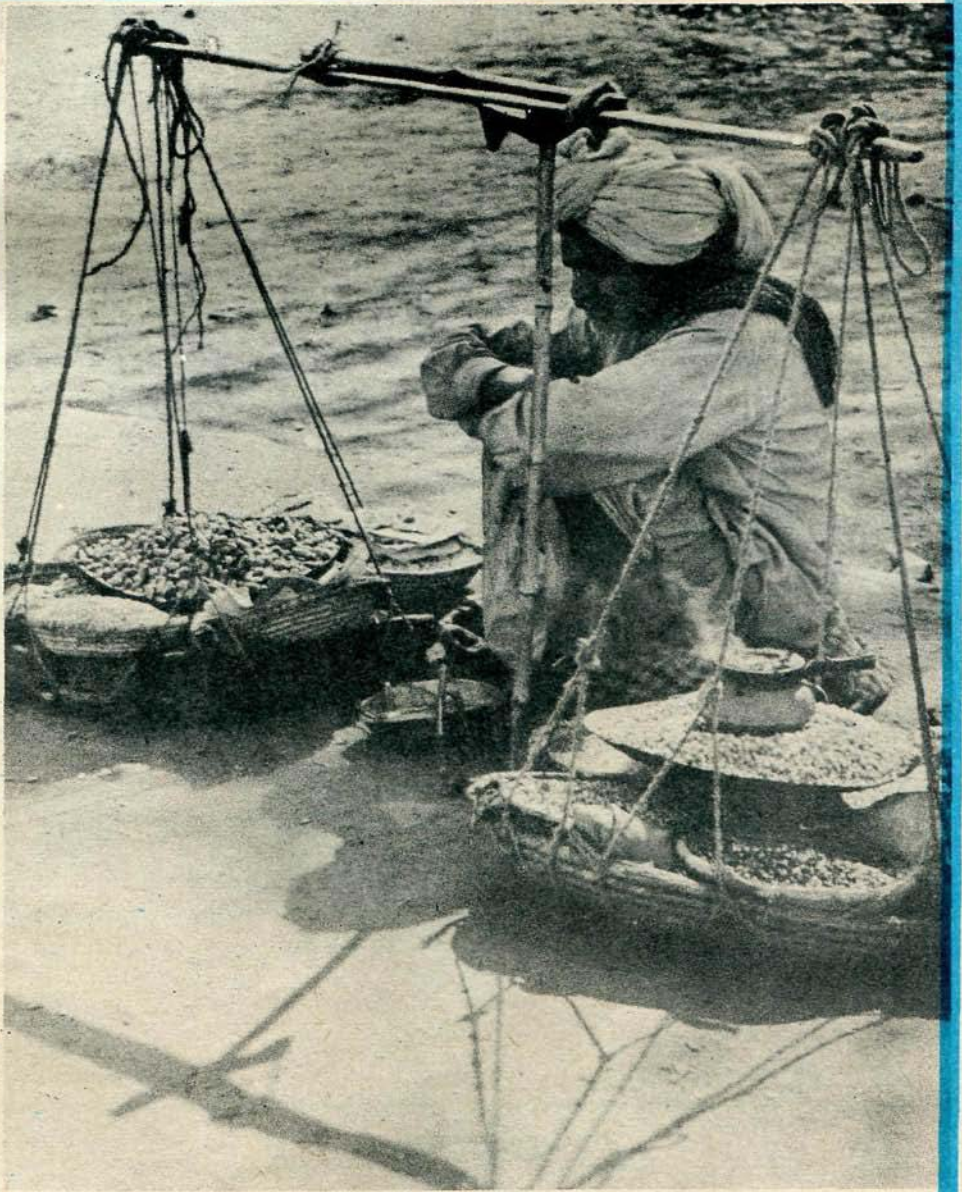
বেচতে চাই

ফটো-পরিচিতি-টীকা প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★ পরিচয়-টীকা ২০শে আগস্টের মধ্যে পেঁছানো চাই।
★ পরিচয়-টীকা দু-একটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর টীকার মধ্যে একটা মিল থাকা চাই। শুধু পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত পরিচয় টীকা সহ বড় ফটো অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।
★ সফল পরিচয়-টীকা প্রতিযোগীর ঠিকানায় কুড়ি টাকা পাঠানো হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র — পাতিহাঁস

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র — খেলার বাঁদর

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'

Colour Printing

By Letterpress...

...Its B. N. K's., superb printing that makes all the difference. Its printing experience of over 30 years is at the back of this press superbly equipped with modern machineries and technicians of highest calibre.

B. N. K. PRESS
PRIVATE LIMITED,
CHANDAMAMA BUILDINGS,
MADRAS-26.

স্কুলে যেতে বাটার জুতো
বাটার ছোটোদের জুতোর নকশা ও নির্মাণ এমনই যে হাঁটতে-চলতে অবাধ সহজ। সুপরিসর এই জুতোগুলোর ওপরচামড়া নমনীয় সামনে আঙুল মেলবার বাড়তি জায়গা, খাপখাওয়ানো গোড়ালি অনায়াসে পা চালাবার মতো তলি— সজীব চঞ্চল পায়ের জন্য ঠিক যা চাই, তা-ই। যেমন আরামভরা, তেমনি টেকসই। স্কুলে প'রে যাবার পক্ষে আদর্শ। আজই নিয়ে আসুন বাচ্চাদের, বাটার দোকানে।
পিন্টু ৬১
৭.৯৫, ৮.৯৫, ১০.৯৫
সানওয়ে ৪১
৯.৯৫, ১১.৯৫, ১৪:৯৫
ওয়েফাইন্ডার্স ৭০
১৭.৯৫, ১৯.৯৫, ২২.৯৫
ওয়েফাইন্ডার্স ৩৩
১৯.৯৫, ২২.৯৫, ২৬.৯৫
১৫.৯৫, ১৭.৯৫, ২০.৯৫
Bata

CHANDAMAMA (Bengali) AUGUST 1972 Regd. No. M. 9100

মহাভারত